প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬

প্রকাশক :
অশোককুমার ঘোষ
কল্যাণী প্রকাশন
৩ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট,
কলিকাতা-১

মুদ্রক :
শ্রীগজেন্দ্রনাথ চৌধুরী
প্রিণ্টার্স কর্নার প্রাইভেট লিঃ
১,গঙ্গাধর বাবু লেন, কলিকাতা-১২

বাইণ্ডার : হেনা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
কলিকাতা-৯

এ বই প্রকাশিত হতে দেখে যিনি সবচেয়ে খুসী হতেন

আমার সেই দীক্ষাগুরু ও মামা পরম শ্রদ্ধেয়

স্বর্গত ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

অবতরণিকা

শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় সমাজবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। কর্মসূত্রে তিনি দীর্ঘকাল উত্তররাঢ় তথা বীরভূম ও সংলগ্ন অঞ্চলে গ্রাম্যজীবনের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই তিনি স্থানীয় লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর বিশেষ অনুরাগের বিষয় হল এই অঞ্চলের লোকসঙ্গীত। তিনি দীর্ঘকাল নানাস্থান ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করে সেইগুলো এই তথ্যমূলক গবেষণা গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

যেখান হ'তে লোকসঙ্গীতগুলো সংগৃহীত হয়েছে তা একটি বিশেষ অঞ্চল। সমগ্র রাঢ় দেশ তাতে পড়ে না, তার উত্তর অংশ পড়ে। তিনি নিজেই বিষয়টিকে পরিষ্কার করে দেবার জন্য বলেছেন যে উত্তররাঢ় মানে সমগ্র বীরভূম জেলা, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমা এবং বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা; অর্থাৎ তার পূর্ব দিকের সীমা হল ভাগীরথী নদী এবং দক্ষিণদিকের সীমা হল অজয় নদ। এই অঞ্চলকে তিনি উত্তর-রাঢ় বলে বর্ণনা করেছেন।

এই গ্রন্থেব প্রথমপর্বে লোকসঙ্গীত সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক আলোচনার পর গ্রন্থকার এই অঞ্চলের সকল লোকসঙ্গীতের পৃথক পৃথক বিবরণ দিয়েছেন। যে শ্রেণীব সঙ্গীতগুলো আলোচিত হয়েছে তাদের কতকগুলির সঙ্গে আমরা বিশেষ পরিচিত যেমন ভাদু, ঘেঁটু, ঝুমুর, আলকাপ, রায়বেশে ইত্যাদি। আবার কিছু অপরিচিত শ্রেণীর গানও এই বিবরণে স্থান পেয়েছে। সুতরাং এই সঙ্গীত সংগ্রহ বেশ ব্যাপক।

দ্বিতীয় পর্বে তিনি এমন কতকগুলো বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গীতের আলোচনা করেছেন যা ঠিক লোকসঙ্গীতের পর্য্যায়ে পড়ে না যেমন বাউল সঙ্গীত, কীর্তন, কবিগান। লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য হ'ল তাকে কোন রচয়িতার নামের সহিত সংযুক্ত করা যায় না। কে বা কারা তা রচনা করেছিল জানা যায় না। পুরুষ পরম্পরায় মুখে মুখে তা প্রচলিত হয়ে এসেছে, অর্থাৎ তার রচয়িতা একরকম বলতে গেলে সমগ্রগোষ্ঠী, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ঘুমপাড়ানী গান। কোন মা কোন সন্তানকে ঘুম পাড়াতে তা প্রথম গেয়েছিল জানা নেই। সেই-মাও তা জানিয়ে রাখতে চায় নি। কিন্তু ক্রমে তা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে সকলের সম্পত্তি হয়ে গেছে। বাউল গান বা কীর্তনের মধ্যে এ লক্ষণ বর্তমান নয়, কারণ তার

অবতরণিকা

রচনা যিনি করেছেন তা অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গীতের শেষে উল্লেখ থাকে। তাদের আলোচনার বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় লোকসঙ্গীতের সহিত তা সঙ্গতি রক্ষা করে না। এ বিষয়ে গ্রন্থকার অবহিত। তা সত্ত্বেও যে তিনি এগুলিকে তাঁর আলোচনার বিষয় করেছেন। তাঁর মূল যুক্তি হল এ ধরণের সঙ্গীত এ অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত, এবং লোকসংস্কৃতির ওপর যারা পরোক্ষভাবে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, মোটামুটি তাদের সান্নিধ্যই তাদের একত্রিত করবার স্বপক্ষে যুক্তি।

এই গ্রন্থের তৃতীয় পর্বে গ্রন্থকার একটি সাধারণ আলোচনা করেছেন ও কিছু সঙ্গীতাদির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পরিশিষ্ট অংশেও কিছু সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে যা নিশ্চিত গ্রন্থটির বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছে।

এইভাবে গ্রন্থটি নানাভাবে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। নানা ধরণের লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে যেমন নানা তথ্য এতে পাওয়া যাবে তেমন এদের সম্বন্ধে সুন্দর বিশ্লেষণমূলক আলোচনাও পাওয়া যাবে। সুতরাং এ সংগ্রহটি নানা তথ্যে এবং তত্ত্বে সমৃদ্ধ হয়ে বাংলার লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি মূল্যবান সংযোজন বলে পরিগণিত হ'বে এমন আশা করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

উপাচার্য্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

শ্রীমান্ দিলীপ মুখোপাধ্যায় যখন তাঁর 'উত্তররাঢ়ের লোকসংগীত' গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন তখন এ গ্রন্থের ভূমিকা লেখক হিসাবে অনধিকারী একথা স্মরণ রেখেও আমি সানন্দে সম্মত হয়েছিলাম। আমার পক্ষে সানন্দে সম্মত হবার কারণ ছিল। শ্রীমান্ দিলীপ যে অঞ্চলের লোকসঙ্গীত নিয়ে গবেষণা করেছেন সেই অঞ্চলের ভূমিতেই আমার জন্ম। গবেষণার কাজে যাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দীর্ঘকাল ধরে তাঁকে ঘোরাফেরা করতে হয়েছে, যাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পাল-পার্বণ, উৎসব-ব্যসন, এক কথায় যাদের সমগ্র জীবনকে জানবার চেষ্টা করতে হয়েছে, আমার জীবনের একটা দীর্ঘকাল জীবনের নানান দেওয়া-নেওয়ার সঙ্গে জড়িত হয়ে তাদেরই মধ্যে কেটেছে। এবং পরবর্ত্তীকালে, যে জীবন শ্রীমান দিলীপ দেখেছেন সেই জীবনকে নিয়েই আমি প্রধানত আমার সাহিত্য রচনা করেছি। সে সাহিত্যে তাদের অবিকৃত জীবন রূপটিকেই যথাসম্ভব তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। কাজেই যখন বইখানির ভূমিকা লিখার আহ্বান পেলাম তখন সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল যে অন্তত কিছু সময়ের জন্য নিজের সেই একান্ত ব্যক্তিগত বালক ও তরুণকালের মানস-জীবনে ফিরে যেতে পারব, সেই মানস-জীবনে পুনর্জন্ম লাভ করে আবার তাকে ফিরে পাবো। বইখানি পড়ে আমার সে আশা পরিতৃপ্ত হয়েছে। মনে হয়েছে লেখাটি পড়তে পড়তে সে জীবনকে আবার ফিরে পেয়েছি।

লোকসঙ্গীতের আঞ্চলিকতা ও নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রথম পর্বে স্থান পেয়েছে। পটুয়া, বেদের গান, ছাদ পেটানোর গান, ভাঁজো, বোলান (ডাক, সাঁওতেলে, পোড়ো ও পালাবন্দী), করম্‌পূজার গান, ভাদু, ঘেঁটু, সহরাই (বাঁধনা), মনসা-পূজার গান, বিয়ের গান, সাঁওতালদের বিবাহ ও গীত, আলকাপ, ঝুমুর, লেটো, রায়বেশে, কৃষকের গান, বিজয়ার গান, হাপু এই নিয়ে তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব। বলাবাহুল্য, আমি বৈজ্ঞানিক বা সামাজিক গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে এগুলির মধ্যে যাই নি। এগুলি পড়েছি আর মনে হয়েছে আমি কাদের কাদের দেখেছি, কেমনভাবে দেখেছি এবং আমার রচনায় কারা কারা এদের মধ্যে এসে জায়গা নিয়েছে, কারা আসে নি, কেন আসে নি, উপরে বর্ণিত তালিকার মধ্যে কোন্ কোন্ শ্রেণীর অস্তিত্ব আমার নিজের অঞ্চলে ছিল, কি ছিল না সব মিলিয়ে লোকজীবনের যে বৃহৎ,

ভূমিকা

ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীন মূর্তিটি রচিত হয়েছে তাতে মনে হল যেন হারানো জীবনের অংশকে খুঁজে পেয়েছি, এবং তার অনেক অজানা ও স্বল্পজানা অংশকে নতুন করে চিনতে পেরেছি। এ গ্রন্থে বাউল ও দেহতত্ত্ব, কবিগান, কীর্তন, চৌপহরা, মনসা-মঙ্গল, মেলা উৎসব নিয়েও আলোচনা রয়েছে। এগুলিকে তৃতীয় পর্বে স্থান দিয়ে লেখক উপযুক্ত কাজ করেছেন বলেই আমার মনে হয়েছে। কারণ এগুলির পটভূমি ও মানসমূর্তি কিঞ্চিৎ পৃথক। পরিশিষ্ট অংশও সুনির্বাচিত।

আমার ব্যক্তিগত রুচি, স্মৃতি ও আস্বাদের কথা বাদ দিয়েও পৃথকভাবে গ্রন্থখানি সম্পর্কে কিছু বলাবও প্রয়োজন আছে। এ গ্রন্থখানি উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীতের সঙ্কলন নয়। সে দৃষ্টি নিয়েও লেখক কাজ করেন নি। তাহলে সঙ্কলনটি অনেক বৃহদায়তন করে তৈরী করবার মত উপকরণ তাঁর ছিল ও তিনি তা করতে পাবতেন। তাঁর রচনা পড়ে মনে হয়েছে তাঁব হাতে সে পরিমাণ উপকরণও অনুপস্থিত নয়। কিন্তু তাঁর রচনা ভিন্ন শ্রেণীর। তিনি প্রাচীনকাল হতে একাল পর্য্যন্ত উত্তররাঢ়ের সামাজিক ইতিহাস অনুধাবন করেছেন ও উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন। এবং সেই অনুভব ও উপলব্ধির আলোকে নিজের সংগ্রহকে বুঝাবার ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে সমগ্র রচনাটি একটি সামগ্রিক দৃষ্টির দ্বারা বিধৃত ও বিশেষ দৃষ্টিকোণের আলোতে আলোকিত। এ বচনায় তাঁর নিজস্ব মতামত আছে আর সে মতামত অস্পষ্ট নয়। অন্য কোন গবেষক তাঁর মতের সঙ্গে একমত না হতে পারেন কিন্তু তাঁর মতামতকে বিচার না করে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।

পরিশেষে একথাও বলি যে শ্রীমান দিলীপ মুখোপাধ্যায় যে কর্ম করেছেন তার মধ্যে তাঁর আলোচ্য-বিষয় সম্পর্কে নিষ্ঠা ও দীর্ঘ শ্রমের স্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। তাঁর নিষ্ঠা ও শ্রমকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারি না। আবও প্রত্যাশা করবো তিনি যেন নিজের অনুসন্ধান ও উপলব্ধির ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করার কাজে নিযুক্ত থাকেন, তাতে তাঁর এবং বঙ্গসংস্কৃতির উভয়েরই কল্যাণ হবে।

টালাপার্ক, কলিকাতা,

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাক্‌কথা

উত্তর-রাঢ়ের অতীত ঐতিহ্য বিগত দশকে পুরাতাত্ত্বিক খননের নিরিখে বারংবার সর্বাধারণ্যে প্রকটিত হইয়াছে। বলাই বাহুল্য, লোকবৃত্তের আঞ্চলিক সন্ধান সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি ভূমির প্রাচীনতায় তাই সম্ভবতঃ ঋদ্ধ ও আকর্ষণীয়।

লোকবৃত্ত বা Folklore-এর সঠিক মূল্যায়ণ এবং ইহাকে বিজ্ঞানের রাজ্যে লইয়া যাইতে হইলে আঞ্চলিক সংগ্রহ, গবেষণা ও প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। লোক সমাজের ব্যবহৃত ভাষা, বি-ভাষা ও উপভাষা সমূহ দৈনন্দিন ব্যবহারের শক্তিশালী ভাষা, জীবনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সেই জন্য আঞ্চলিক গবেষণার প্রয়োজন। সঠিক আঞ্চলিক গবেষণার দ্বারা সেই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক চেতনা, জীবনযাত্রা ও অধিবাসী সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

এ কথা সকলেরই জানা যে জীবন-সংগ্রামে সাফল্যলাভ করিবার জন্য প্রত্যেকটি মানুষকে জীবন সংগ্রামের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে; জীবনের অভীষ্ট ও সিদ্ধির উপায় জানিতে হইবে। জীবনে উন্নতি লাভের ইহাই যথার্থ পথ। এই জ্ঞান প্রত্যেক মানুষেরই আছে। জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা তাহার স্বভাবসিদ্ধ এবং প্রকৃতিগত বিচার বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত। লোকবৃত্তে লোক জীবনের সেই জ্ঞানেরই প্রকাশ। লোকশিল্পী সংসারাভিজ্ঞ বাস্তব সচেতন শিল্পী। তাঁহারা তাঁহাদের দেখা যে সমাজের চিত্র অঙ্কন করেন তাহা নিখুঁত ও সম্পূর্ণ করিয়াই আঁকিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের সৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ তাঁহাদের দৈনন্দিন কথা বার্তা,ভাবভঙ্গী, আচার-ব্যবহার, সুখ-দুঃখ লইয়া আত্মপ্রকাশ করেন। গ্রাম্যজীবনের বলিষ্ঠ উপলব্ধিতে যে স্বাভাবিক গ্রাম্যতা দৃষ্ট হয় তাঁহাতে লোকশিল্পী ভীত বা লজ্জিত নহেন। তাঁহাদের প্রাণ আছে বলিয়াই তাহারা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারেন, গলা ফুলাইয়া চিৎকার করিতে পারেন, অক্লান্ত কথা বলিয়া শ্রোতাকে ক্লান্ত করিয়া দিতে পারেন। ইহা বাংলার লোক জীবনের তথা বাঙালী জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত বৈশিষ্ট্য; চিরন্তন ভাবভঙ্গী।

কিন্তু আমাদের তথাকথিত ভদ্র সমাজ নতুন আদব কায়দা আয়ত্ত করিয়াছে, নতুন ধরণের ভদ্রতা শিখিয়াছে, যেখানে প্রাণখোলা হাসির নাম অভব্যতা, যেখানে আন্তরিকতার নাম গ্রাম্যতা, যেখানে সরলতার নাম অসভ্যতা। যাহারা নিছক

প্রাক্‌কথা

মনোবিলাসের মোহে সভ্য, যাহাদের প্রাণের অনুভূতি প্রায় নাই বলিলেই চলে তাহারা সব জিনিষটিকে বিদেশী কেতায় ও দর্পণে দেখিবার চেষ্টা করে। অভিজাত সম্প্রদায় কখনই এই কথা বুঝিতে চেষ্টা করে না যে, যে কোন জাতির সাধনা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ভাষা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। গ্রাম ও সহর উভয়কে লইয়াই তাহার বিস্তার। গ্রামকে উপেক্ষা করিয়া, গ্রামের মানুষকে ইতর বা বর্বর মনে করিয়া গ্রামের কথা বলা যায় না, বলা সমীচীনও নয়। পল্লী ও লোক সাহিত্যকে উপেক্ষা করিয়া অভিজাত সাহিত্যও স্থায়িত্ব পাইতে পারে না বলিলে বোধহয় সাংঘাতিক ভুল করা হইবে না। তাই আর্ট ও আত্ম-সর্বস্ব ভদ্র সম্প্রদায় লোক-জীবন ও লোকবৃত্তের প্রতি যতই নাসিকাকুঞ্চন করুক না কেন, বাংলার লোকবৃত্ত বাঙালী জীবনের নিতান্তই নিজস্ব ও চিরন্তন হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে। কারণ বাংলার লোকবৃত্তের ভাষা ও সাংস্কৃতি চেতনার যাবতীয় উপাদান বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ ও বাস্তব জীবনের নিজস্ব। ইহা প্রাণের পরম্পরাগত সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়ের 'উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত'' গ্রন্থেও এই ঘোষণা স্পষ্ট। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠক বিস্মৃত অতীতের অনেক কিছু রোমন্থনে সমর্থ হইবেন। গ্রাম বাঙলার দিকচক্র, সীমায়িত আকাশ, বিচিত্র সব পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, নাচ-গান প্রভৃতি সবকিছুই তাঁহার কাছে নূতন করিয়া প্রতিভাত· হইবে; লোকজীবনের অনেক কিছুকেই নূতন করিয়া পাঠকের সঙ্গে পরিচিত করাইবে, সাধারণ মানুষের জীবনপ্রণালী, চিন্তা, কল্পনা আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ ও বেদনার সবকিছুই নূতন করিয়া উদ্ভাসিত হইবে। ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথাই নিপুণভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাঁহাদের রচনায়। আর এই জন্যই তাঁহারা গ্রন্থকার শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়কে স্বাগত জানাইয়াছেন। আমিও তাঁহাদের সুরেই সুর মিলাইয়া তাঁহাকে স্বাগত জানাইব।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, প্রকাশিত গ্রন্থের বিভিন্ন রচনা বিভিন্ন সময়ে রচিত বলিয়া কিছু পুনরুক্তি দোষ আছে। তাহাছাড়া ইহা গ্রন্থকারের প্রথম পুস্তক হওয়ায় কিছু উচ্ছ্বাসের আধিক্যও প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু আন্তরিকতার অসদ্ভাব কোথাও নাই। এই আন্তরিকতা গ্রন্থের যেকোন দোষকে স্খালন করিতে সক্ষম। আশা করি এই গ্রন্থের প্রকাশনায় লেখক অন্যান্য গ্রন্থ রচনায়তৎপর হইবেন।

ইণ্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটী, কলিকাতা। শঙ্কর সেনগুপ্ত

কথারম্ভ

প্রতিটি বই-এর ক্ষেত্রেই লেখকের নিজস্ব কিছু বক্তব্য থাকে, তার কিছু প্রকাশিত হয় কিছু বা থাকে অপ্রকাশিত। আমারও কিছু নিবেদন আছে, তা নিছক ব্যক্তিগত। এ বই-এর উপকরণ সংগ্রহ করতে শুরু করি প্রায় নয় বৎসর পূর্বে আর একটি বই লেখার প্রয়োজনে। সে বইটির নাম 'মহম্মদবাজারের ইতিকথা।' যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকুল্যে প্রকাশিত হয়েছে। বিচিত্র গ্রামীণ সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ করার জন্য তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কমিশনার শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই. সি. এস. যুগ্ম উন্নয়ন কমিশনার শ্রীসুনীলবরণ রায়, আই. এ. এস. এবং উপ-উন্নয়ন কমিশনার শ্রীসমরতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. এ. এস. আমাকে উৎসাহিত করেন।

উত্তররাঢ় এলেকা নির্বাচনের পিছনে দুটি কারণ ছিল। প্রথমত—এই এলেকায়ই জীবিকা ও আত্মীয়সূত্রে আমার গতিবিধি সীমাবদ্ধ। আমার দৈনন্দিন জীবনের চলাফেরা আর জানাশোনার সঙ্গে এ অঞ্চলের গ্রামজীবনের একটি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমার শৈশব আর কৈশোরের অধিকাংশ উজ্জ্বল স্মৃতিই এ এলেকার মেলাখেলা, উৎসব, পালপার্ব্বণ, লোকসঙ্গীত আর লোকনৃত্যের আলোকে আলোকিত। জীবিকার সূত্রেও এই এলেকার গণজীবনের মাঝেই আমার আনাগোনা। দ্বিতীয়ত—লোকসংস্কৃতি তথা লোকসঙ্গীত সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থে বা পত্র-পত্রিকায় যা আলোচনা হয়েছে তাতে মুখ্যত উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। আলোচনার সুর বজায় রাখতে গিয়ে রাঢ় দেশের সংস্কৃতির কথাও আলোচিত হয়েছে একথা সত্য কিন্তু বিভিন্ন কারণে যে সব আলোচনায় রাঢ় এলেকার প্রতি সুবিচার করা হয় নি। এই জনপদের গনজীবনে যে সাংস্কৃতিক চেতনা তার সাথে অনেকেই একাত্ম হতে পারেন নি। হয়তো আমার পক্ষেও সম্ভব হয় নি। তবুও এই এলেকার অধিবাসী হিসাবে আমার এই প্রচেষ্টার পিছনে আন্তরিকতার কোন অভাব নেই।

সুযোগ পেলেই জানতে চেষ্টা করেছি জনপদের অধিবাসীদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি আর সাংস্কৃতিক জীবনের কথা। সুদূর পল্লীঅঞ্চলে আদিবাসী ও আর্য্যেতর সম্প্রদায়ের সঙ্গে এ বই-এর প্রয়োজনে দিনের পর দিন গল্প করেছি, তাদের গান শুনেছি, নাচ দেখেছি। এদেশের মেলাখেলায়, উৎসবে, পূজার্চ্চণায়

কথারম্ভ

আমি উপস্থিত থেকে এদের সাথে আনন্দের অংশগ্রহণ করেছি। আমার কাছে বসে কখনওবা বর্ষীয়সী মহিলার চোখ ছল ছল করে উঠেছে প্রবাদ প্রবচন, উপকথা আর কিম্বদন্তীর ব্যাখ্যায়, কখনওবা আমার কৌতুহলী মনের অহেতুক প্রশ্নবানে তারা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে, সঙ্গীতের রস ব্যাখ্যানে মহিলার দল হেসে গড়িয়ে পড়েছে। আমি তখন তাদের কাছে ছেলেমানুষ। অনেক গানের অর্থ তারা নিজেরাই বলতে পারে নি বা বলতে চায়নি।

এ গ্রন্থ লেখা সুরু করেছিলাম প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে। প্রায় তিন বৎসর পূর্বে এ বই-এর কিয়দংশ কবি শ্রীআনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'সমকালীন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম হতেই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য শ্রদ্ধেয় শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য আমাকে সাহায্য করেছেন। সুসাহিত্যিক ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অনুরোধে যে মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন তা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। ভারতীয় লোকবৃত্তের পুরোগামী গবেষক এবং ইণ্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত নানা উপদেশ দান ও প্রাককথন সংযুক্ত করে যেভাবে আমাকে যেভাবে উৎসাহিত করেছেন তা একমাত্র তাঁর মত গবেষকের পক্ষেই সম্ভব। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই। আমার মামা ডাঃ কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকা শ্রীদুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় অগ্রজতুল্য শ্রীফণীন্দ্র হালদার, বন্ধু শ্রীসুরজিৎ মুখোপাধ্যায় ও মহম্মদ সফি এই বই লেখায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তা ছাড়া সুসাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীহেমাঙ্গ শ্রীবিশ্বাস, শ্রীখালেদ চৌধুরী, শ্রীভোলা ভট্টাচার্য, শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল, শ্রীঅরুণ রায় আমাকে বইটি প্রকাশের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। যাঁরা লোকসঙ্গীত সংগ্রহকালে সঙ্গ দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছেন, যেসব শিল্পীদের কাছ থেকে আমি গানগুলি সংগ্রহ করেছি, যাঁদের আলোচিত গ্রন্থ হতে আমি দিগ্‌নির্দেশ পেয়েছি এই বই-এর প্রকাশকালে তাঁদের সকলকে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ গ্রন্থের কৃতিত্ব আমার সাথে সকলেরই প্রাপ্য, 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার'-এ তাঁদের নাম প্রকাশ করেছি।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

উত্তর-রাঢ় সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য

সমগ্র বীরভূম জেলা, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমা বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত।

এলেকা—২৬১৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা—২৩,১৮,৬৮৩

গ্রামসংখ্যা—৬,০৯১ গ্রামের লোকসংখ্যা—১৯,১৩,৬৩১

পুরুষ—১০,০৬,৮১৬ মহিলা—৯,০৬,৮১৫

শিক্ষিতের সংখ্যা—শতকরা ১৮·২ জন

তপশিল ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান জাতিগুলির লোকসংখ্যা—

বাগ্দি—১,৫৪,৮৪৬, বাউড়ী—৪৬,৭৭৮, মুচি—৮৫,৮২৪, ধোপা—৫০১৭, ডোম—৪৪,৬৮৮, হাঁড়ি—২৬,০৫১, জেলে—৪,৬৭২, কেওট—২,৮২৩, মাল—৫২,৮১৮, কোনাই—২৪,৯৬১, নমঃশূদ্র—১১৫৪০, রাজবংশী—১৫,৫৭৭, শুঁড়ি—১৯৬৭৫, লোহার—৪৯৩৭, কোটাল—৩১৩৬, সাঁওতাল—৭১৪৩৩, ওঁরাও—৮৯১, কোরা—৫৯০৭।

বিশেষ মেলাখেলা

স্থান	সময়	উপলক্ষ্য
পাথরচাপরী	ফাল্গুন-চৈত্র	দাতাসাহেব
বক্রেশ্বর	শিবচতুর্দশী	বক্রেশ্বর
কেন্দুলী	পৌষসংক্রান্তি	জয়দেব
শান্তিনিকেতন	৭ই পৌষ	মহর্ষির দীক্ষা
শ্রীনিকেতন	ফাল্গুন	শিল্প ও কৃষিপ্রদর্শনী
লাভপুর	মাঘীপূর্ণিমা	ফুল্লরা
নানুর	কার্ত্তিক	চণ্ডীদাস
কলেশ্বর	শিবরাত্রি	কলেশ্বর
তারাপীঠ	আশ্বিনের শুক্লাচতুর্দশী	তারা মা
জাজিগ্রাম, আকালিপুর, বারালা	আশ্বিন-কার্ত্তিক	কালিপূজা

প্রধান প্রধান মন্দির

স্থান	দেবদেবী
ভাণ্ডিরবন	শিবগোপাল
সাঁইথিয়া	নন্দিকেশ্বর
বক্রেশ্বর	বক্রনাথ
কলেশ্বর	অনাদি লিঙ্গ
লাভপুর	ফুল্লরা
নানুর	বিশালাক্ষী
বীরচন্দ্রপুর	বাঁকারায়
কোটাসুর	মদনেশ্বর
গণপুর	২৫০ বৎসরের অধিক শিব
নলহাটি	ললাটেশ্বরী

উত্তর-রাঢ় সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য

স্থান	সময়	উপলক্ষ্য	স্থান	দেবদেবী
দধিয়া	[illegible]	বৈরাগীতলা	[illegible]	অপরাজিতা
উদ্ধারণপুর	চৈত্রসংক্রান্তি	গাজন	কেন্দুলী	রাধাবিনোদ, জয়দেবের সিদ্ধপীঠ
ক্ষীরগ্রাম		যোগাদ্যা	গোকর্ণ	নরসিংহদেব
পীঠস্থান			গোবরহাটি	পঞ্চরত্ন
তারাপীঠ			কান্দি	ডুহালিয়া (কালি, রুদ্র)
কঙ্কালীতলা				
নলহাটি			জজাং	সর্বমঙ্গলা
সাঁইথিয়া			পাঁচথুপি	নবরত্ন
ক্ষীরগ্রাম			জগদানন্দপুর	রাধাকৃষ্ণ
লাভপুর			কাটোয়া	গৌরাঙ্গ
বক্রেশ্বর			অট্টহাস	ফুল্লরা
			পাইকর	বুড়োশিব, মনসা সূর্য্য, বিষ্ণু, গণেশ

নদনদী—গঙ্গা, ময়ূরাক্ষী, অজয়, হিংলো, দ্বারকা ব্রহ্মাণী, বাঁশলোই, কোপাই, পাগ্‌লা, বক্রেশ্বর, ঘড়ি।

গাছপালা—শাল, পিয়াল, কেঁদ, মহুয়া, হরিতকি, অশ্বত্থবট, বাবলা, তাল, খেজুর, আম, জাম, কাঁঠাল, পিপুল, পলাশ, মান্দার।

বনবাদাড়—ইলামবাজারে চৌপাহাড়িয়া (৫·৪৬ বর্গমাইল), হেতমপুর, রাজনগর ও মহম্মদবাজারের বিস্তৃত অংশ।

ঘরদোর—কাঁন্দি অঞ্চলে—বড়ঘর, পাকের ঘর, ঢেঁকিশালা, গোশালা। অন্যান্য অঞ্চলে—শোওয়ার ঘর, রান্নাঘর, বৈঠকখানা, গোয়ালঘর। নিম্নবিত্তদের ক্ষেত্রে শুধু শোওয়ার ঘর ও রান্নাঘর। প্রায় ক্ষেত্রেই উঠোন থাকে। সাধারণত মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালই দেখা যায়। সম্পন্ন চাষীগেরস্থরা টিনের বা টালির চালা দেয়। আদিবাসীদের গৃহে শোওয়ার ঘর, ভাঁড়ার ও রান্নাঘর, মুরগী ও শুয়োরের ঘর থাকে।

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ভারত সরকারের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের জন্য এই পুস্তকের সুলভ মূল্য সম্ভব হয়েছে।

এ গ্রন্থ প্রকাশে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙালীর ইতিহাস" ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের "বাঙলার লোকসাহিত্য", ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের "লোকায়ত দর্শন", ডঃ সুকুমার সেনের "বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস", শ্রীগোপাল হালদারের "বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা", ডঃ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির "বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল", শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত "রেইন ইন ইণ্ডিয়ান লাইফ এণ্ড লোর", ও "ট্রি সিম্বল ওয়ারশিপ ইন ইণ্ডিয়া", শ্রীমণি বর্ধনের "বাঙলার লোকনৃত্য", শ্রীবিনয় ঘোষের "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি", "দেশ" লোকসাহিত্য সংখ্যা ও "ফোকলোর" পত্রিকা থেকে নানা ভাবে সাহায্য গ্রহণ করেছি। এঁদের ঋণ স্বীকার করছি।

সংগ্রহ কার্যে যাঁদের কাছে সাহায্য পেয়েছি তাঁরা হলেন ডাঃ কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বশ্রী আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহম্মদ সফি, হাসান মুর্শিদ, সুরজিৎ মুখোপাধ্যায়, সিধু হালদার, শঙ্কর বাগদী, নিমাইচাঁদ, মণ্ডল, তরুণ মুখোপাধ্যায় ও প্রচ্ছদের জন্য সুবীর সেন। এঁরা সকলেই আমার বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

মুদ্রণের ব্যাপারে শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার ও তাঁর প্রেসের কর্মিগণ যে সহযোগিতা দেখিয়েছেন তা ভোলার নয়।

কিছু কিছু রচনা "সমকালীন" ও "চতুষ্কোণ" পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে, এদের সম্পাদক যথাক্রমে শ্রীআনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও শ্রীশিবপ্রসাদ চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বশেষে "ইণ্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটীর" সাধারণ সম্পাদক ও রিসার্চ ডিরেক্টর শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্তের সহযোগিতা ও ঋণের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। শতকার্যের মধ্যে ব্যস্ত থেকেও যেভাবে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন তা চিরদিন মনে থাকবে।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব

আলোচ্য গ্রন্থে উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; অবশ্য সঙ্গীত বলতে যে সুরের কথা আসে, বর্তমান গ্রন্থে তার কোন নিদর্শন পাওয়া যাবে না। এখানে কিছু সঙ্গীত নানা সূত্র থেকে সংগ্রহ করে তার আংশিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। এবং আমাদের সংগ্রহ উত্তর-রাঢ়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। স্বভাবতই সুরুতে তাই উক্ত অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমা ও অধিবাসী সম্পর্কে কিছু নিবেদন করা আবশ্যক।

বাঙলা প্রাচীন জনপদের অন্যতম একটি ছিল রাঢ় অঞ্চল, যাকে আবার দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছিল—উত্তর-রাঢ় ও দক্ষিণ-রাঢ়। এই উত্তর-রাঢ় বলতে বোঝা যেত বর্তমানের মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কাঁদি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম (সাঁওতালভূমি সহ) জেলা আর বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ। মোটামুটি অজয় নদ এই উত্তর-রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা।

এই উত্তর-রাঢ় সম্পর্কে ডঃ শ্রী সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে যে বিবরণ দিয়েছেন তা হচ্ছে—"উত্তর-রাঢ়ের প্রথম উল্লেখ পাইতেছি আনুমানিক নবম শতকের গঙ্গারাজ দেবেন্দ্র বর্মণের এক লিপিতে এবং তারপর একাদশ শতকের রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে।····· রাজা ভোজ বর্মণের বেলাব লিপিতে উত্তর-রাঢ় ও তদন্তর্গত সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ আছে। সিদ্ধল গ্রাম বর্তমান বীরভূমের অন্তর্গত সিধল গ্রাম। এই সিদ্ধল গ্রামই পণ্ডিতমন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের জন্মভূমি। তথাকথিত ভুবনেশ্বর লিপিতে ভবদেব ভট্ট তাঁহার জন্মভূমি সিদ্ধল গ্রামের কথা বলিয়াছেন এবং রাঢ়ের এই অঞ্চল যে অজলা ও জঙ্গলময় তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন। বল্লাল সেনের নৈহাটি লিপি অনুসারে

উত্তর-রাঢ় বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের আমলে দেখিতেছি উত্তর-রাঢ়মণ্ডল গ্রামভুক্তির অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে।..... ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড অধ্যায়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে রাঢ়ীখণ্ড জাঙ্গল নামে এক জনপদ এবং তদন্তর্গত বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর, বীরভূম প্রভৃতি স্থান এবং অজয় প্রভৃতি নদ-নদীর উল্লেখ আছে"।

পশ্চিম বাঙলার তথা উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীতে দারুণ প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য আছে। একথা সকলেই জানেন যে স্থানীয় বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে নানা দেশের লোকসঙ্গীত বিভিন্ন দেশের বিশেষ কোন কোন জনপদ জুড়ে সুদীর্ঘকাল ধরে আপন মহিমায় পরিব্যাপ্ত থাকে। নিজস্ব সম্পদ আর ঐতিহ্যের কৌলীন্যে সেই জনপদ গণজীবনের চেতনায়, বোধে ও সংস্কৃতি ধারায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীতের যে বহুবিধ ধারা—সারা বছর জুড়ে বৃহত্তর গণজীবনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও সামাজিক উৎসবে বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় বিস্তারলাভ করেছে—তা' অন্যত্র দুর্লভ না হলেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দাবীদার।

এই বৈশিষ্ট্যের কারণ মূলতঃ এর ভৌগোলিক অবস্থিতি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনের প্রসার। ঐতিহাসিক কারণে বিভিন্ন সময়ে বাংলার প্রশাসনিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মীয় মতবাদের যে পরিবর্তন ঘটেছে তার সবকিছুই গ্রহণ করেছে এই জনপদ। স্বকীয় ধর্মমতে বিশ্বাসী নিপীড়িত সম্প্রদায় কালবিশেষে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে তাদের প্রাণের ঠাকুরকে টিকিয়ে রেখেছে। বাঁচিয়ে রেখেছে তাঁদের সমষ্টি চেতনার যত্নপুষ্ট ধর্মচেতনা। এট চেতনা শুধু পূজাপ্রকরণ আর আচার কৌশলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। কখনও সহজ, সরল মধুরভাবের লোকসঙ্গীত আর নৃত্যে, কখনও নিষ্ঠাচারের বিধিবদ্ধতায়, কখনও গোঁড়ামির ভয়াবহ বীভৎসতায় স্বকীয় মহিমা ঘোষণা করে জাতীয় সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে।

এই অঞ্চলের গণজীবনে ধর্ম শুধু একটি আচারানুষ্ঠান বা সাধনপ্রক্রিয়া নয়। দেবতার সাধনায় মন্দিরে, মসজিদে নিষ্ঠাচার ও মন্ত্রোচ্চারণের মধেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। ধর্ম এখানে একটি বিশ্বাস। সুখদুঃখের প্রকাশ। আত্মোপলব্ধির অন্যতম একটি পথ, তাই এখানে ধর্মচেতনা বিশেষ কোন শ্রেণী বা কালের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর জীবনবোধে প্রসারিত হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণী বা সমাজসচেতনায় ধর্ম ঐক্যের উপাদান সংগ্রহ করেছে কাল হ'তে কালান্তরে। হয়ত বাহ্যিক আচারানুষ্ঠান নিয়ে মতবিরোধ ঘটেছে, কিন্তু পাপপুণ্য-বোধ, অথবা সেবা-বোধ এবং দুর্বলকে রক্ষার প্রচেষ্টা ও সর্বোপরি ঈশ্বর ও ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবে যে অপরিসীম বিশ্বাস তা নিয়ে মতবিরোধ ঘটেনি। মানবধর্মের এই উদারবিস্তৃত আধারেই লোকসঙ্গীতের প্রকাশ

ও বিকাশ। তাই লোকসঙ্গীতে যে ধর্মের গান, তা জীবনের গান। যদিও সেখানে আছে বিশ্বাস, আর সংস্কারেরই মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব। ধর্ম এবং জীবন তাই অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। ধর্ম ছাড়া জীবনের কোন উৎসবই এই অঞ্চলে কল্পনা করা যায় না। আর উৎসবে আছে নৃত্যগীত, আছে হাস্যপরিহাস, আর আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা। সর্বত্রই ধর্মের মহিমা। ধর্ম এখানে বিধিবদ্ধতাকে উপেক্ষা করেছে। জীবনের উৎসবকে গ্রহণ করে জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে।

এই বিস্তৃত জনপদে বোধকরি এমন কোন গ্রাম নাই—যেখানে কোন না কোন লোকসঙ্গীতের চর্চা নেই। প্রায় সারা বছর জুড়ে কোন না কোন পূজা বা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের আখড়ায় ঝিঁ ঝিঁ ডাকা সন্ধ্যা হতে সুরু করে নিঝুম নিশীথ পর্যন্ত এই সঙ্গীতের আসর চলে। কোথাওবা যাত্রাগান, কোথাও আলকাপ, লোটো, মনসা-মঙ্গল বা পালাবন্দী অথবা বোলানের মহড়া, আবার কোথাও চলে ভাঁজো বা ভাদুর পূর্ব-প্রস্তুতি। পীরের আস্তানা নেই, ফকিরের দরগা নেই, বাউল-বৈষ্ণবের আখড়া নেই, যাত্রা বা আলকাপের দল নেই—এ অঞ্চলে এমন গ্রাম কোথায়? শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব আর বাউল ফকিরের বিচিত্র চারণভূমি এই রাঢ়। লোকালয় হতে দূরে নদীর ধারে জঙ্গলের মাঝে বা পাহাড়ের কোলে গড়ে উঠেছে কত সিদ্ধপীঠ। গাঙ্গেয় সভ্যতার ক্রমবর্ধমান আলোকচ্ছটা এখানে প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত, পরোক্ষভাবে যা এসেছে তা ধর্মান্ধতাকে কিছু পরিমাণে সংযত করেছে। কিন্তু কোন যুক্তি-বিশ্বাসই এদের সযত্নপোষিত প্রাচীন ধর্মাবোধকে মুছে ফেলতে পারে নি। তাই প্রতিটি মেলা আর উৎসবের সাথে জড়িয়ে আছে কুলদেবতা অথবা গ্রাম-দেবতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ। আর এই মেলা আর উৎসবেই লোকসঙ্গীতের সার্থক অভিব্যক্তি।

কুলদেবতার উপাসনায় যে উৎসব তার সাথে লোকাচারের যোগাযোগ নেই বললেও চলে। কিন্তু গ্রামদেবতার পূজার্চনায় যে আনন্দোৎসব তার সাথে গ্রামের কোমজীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। যে কোন সামাজিক উৎসবে এই গ্রাম-দেবতার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

লোকসঙ্গীতে আর লোকনৃত্যেই এই জনপদের বৃহত্তর গণজীবনের আনন্দের অভিষেক। কারণ সঙ্গীত ও নৃত্য ব্যতীত আনন্দ প্রকাশের আর কোন আধার এদের জানা নেই। আনন্দে উদ্বেল আর নেশায় বিভোর হয়ে সম্পূর্ণ সমাজই সঙ্গীত আর নৃত্যে মেতে ওঠে। বুদ্ধিজীবীর মোহ বা অহঙ্কার নেই। দেবতাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য, আপন করে পাওয়ার জন্যই সমষ্টি সঙ্গীত ও নৃত্য একটি

আবশ্যিক অনুষ্ঠান। এরই মাধ্যমে আবহমানকালের সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ও আদিমরূপটি নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

সাঁওতালভূমির একাংশ উত্তর-রাঢ়ের সমতলভূমি স্পর্শ করায় আদিবাসীদের সমাজজীবনের সারল্য আর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে গৌরবান্বিত যে লোকসঙ্গীতের ধারা তা' উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছে। বীরভূম জেলার পশ্চিমে ও উত্তরপশ্চিমে নানা শ্রেণীর উপজাতিদের বসবাস যারা মূলতঃ দ্রাবিড়ভাষী বা কোলমুণ্ডা ভাষী। উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীতে ভাষাভাষী অধিবাসীদের বিস্ময়কর অবদান আছে।

ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলের ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঐ অঞ্চলে আশানুরূপ হয় নি। নিষ্ঠাচারের বজ্র আঁটুনীতে নাকি লোকসঙ্গীতের স্বচ্ছন্দ গতি সেখানে ব্যাহত। শিক্ষাভিমানীর দাবী মেটাতে গিয়ে সেখানকার লোক-সঙ্গীত নাকি কিয়দংশে কৃত্রিম। কিন্তু ভাগীরথী হ'তে দূরস্থ উত্তর-রাঢ়ের মুষ্টিমেয়র মধ্যে সীমাবদ্ধ ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি অর্থনৈতিক অধিকারকে কুক্ষিগত করলেও সমষ্টির সংস্কৃতি চেতনাকে গ্রাস করতে পারে নি। বরং কোথাও কোথাও কৌম-সংস্কৃতিতেই ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে।

ভূমি ও শস্য বণ্টনের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য, তারই অনিবার্য্য পরিণতি হিসাবে এসেছে অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা। এই অর্থনীতি শ্রমনির্ভর মানুষের সমাজ জীবনে যে মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে লোকসঙ্গীতের স্বাভাবিক প্রসার-লাভে তা' এক প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ। তাই শুধু ধর্মবোধ তথা মানবিকতায় অপরিসীম বিশ্বাসই এই অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এই জনপদেই বাঙলাদেশের বৈষ্ণব ও বাউল গীতির সমধিক চর্চা। তাই এই অঞ্চলের সমস্ত লোকসঙ্গীতের সুরে বাউল ও কীর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

আঞ্চলিক চেতনা

আজ আমরা বাঙালী জাতি ব'লতে যা বুঝি তা বহু বিচিত্র গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ। এক কৌমের সাথে অন্য কৌমের যোগাযোগ ব্যবস্থা শিথিল ছিল। বিধিনিষেধও ছিল প্রচুর। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে সভ্যতার আদান প্রদানের সাথে এই বিধিনিষেধ শিথিল হ'য়ে যায়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে বৃহত্তর কৌমজীবন গড়ে উঠে। আত্মরক্ষার তাগিদে পরস্পর পরস্পরের সাথে ভাবের আদানপ্রদান করতে থাকে। বিভিন্ন বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এক বিশেষ

জনপদের সৃষ্টি হয়। আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌমচেতনার অবলুপ্তি ঘটে। রাঢ় অঞ্চলকে অবলম্বন করেই রাঢ়োঃ জনপদের জীবনধারা আবর্তিত হয়।

কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক চেতনা সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক চেতনাকে যে প্রভাবিত করবেই একথা সকলেরই জানা। আঞ্চলিক চেতনা ধনোৎপাদন পদ্ধতির জন্যই বিশেষভাবে প্রসারলাভ করেছে। ইতিহাসেব আলোচনা করলে দেখা যায় যে হঠাৎ হঠাৎ বাণিজ্য নির্ভরতার সাময়িক পবিবর্তন ছাড়া সৃষ্টির সুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত গ্রামজীবনে কৃষিনির্ভরতা সমান গতিতে অব্যাহত। যে ভূমিকে কেন্দ্র করে এই কৃষিনির্ভরতা সেই ভূমি কিন্তু নিশ্চল, অনড। বিশেষ কোন অঞ্চলের অধিবাসী সেই অঞ্চলের ভূমি ও তার উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। তাই নির্দিষ্ট ভূমিকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক চেতনা, যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তাতে আঞ্চলিকতা থাকবেই।

উত্তর-রাঢ়ের গোষ্ঠী বা জনের মাঝেই উত্তর-রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি আবর্তিত। যদিও একথা সত্য—যে কোন আঞ্চলিক চেতনাই সামগ্রিক কৌমচেতনায় অবলুপ্ত। প্রাচীন যুগ হ'তে সুরু করে মধ্যপূর্বযুগ পর্য্যন্ত বাঙলার সর্বত্রই কৌমচেতনার একক প্রসার। ওরা দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সমান গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছে। পরবর্তীকালে শ্রেণী ও বর্ণ বিন্যাস, নগর ও পল্লী বিন্যাস, সর্বোপরি রাষ্ট্র বিন্যাসের ক্ষেত্রে কৌমচেতনার প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হ'লেও একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায় নি। রাষ্ট্রবিন্যাস আঞ্চলিক চেতনাকে পরিস্ফুট করলেও আদিম কৌমচেতনা এক অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনধারার সাথে অন্য অঞ্চলের জীবন-ধারার যোগসাধনে সহায়তাই করে থাকে।

তাই উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত বিশ্লেষণে যদি সমগ্র বাঙালী জাতির কৌম-চেতনার আনুপূর্বিক ধারাটি ইতিহাসের সাথে সঙ্গতি রেখে আলোচনা করা যায় তাহ'লে এ অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে কোন অসুবিধা হ'বে না ব'লেই মনে হয়। ইতিহাস আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে—উত্তর-রাঢ় তথা রাঢ়ের আঞ্চলিক চেতনা বাঙলা দেশের বৃহত্তর কৌমচেতনায় অবলুপ্ত।

সারা বাঙলার লোকসঙ্গীতে তথা সাংস্কৃতিক জীবনে একটি মূলগত ঐক্য আছে। বিশেষ করে ভূমি ব্যবস্থা—যার উপর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা অনেকাংশে নির্ভরশীল—তা' বাঙলা দেশের প্রায় সর্বত্রই সমান। তাই ভূমি ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে সাধারণ

মানুষের জীবন যাত্রায় সুখদুঃখের যে অনিবার্য্য ইঙ্গিত তা' বাঙালা দেশের প্রায় সর্বত্রই সমানভাবে নাড়া দিয়েছে। আর ঠিক সেই কারণেই ভাষা, সুর, ছন্দবৈচিত্র্য প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদিতে আঞ্চলিকতা থাকলেও ভাবের ক্ষেত্রে সুদূর উত্তরবঙ্গ অথবা পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীতের সাথে উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীতের মূলতঃ কোন তফাৎ নেই। উত্তর-রাঢ়ের হাটে-মাঠে-ঘাটে আর মেলা-খেলায় লোকসঙ্গীতের সুরে প্রণয়ীর যে প্রাণের ব্যথা ভেসে উঠে তা' সারা বাঙলার বিরহ কাতর দয়িত মনকেই স্পর্শ করে।

উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীতের নিজস্ব কোন ইতিহাস নেই। বর্তমান গ্রন্থও ইতিহাস নয়। এখানে এই জনপদের একটি বিশেষ ভৌগোলিক সত্তা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে লোকসঙ্গীতের নিজস্ব একটি রূপ, পরিবেশনের একটি ভঙ্গী, ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাঙলার লোকসঙ্গীত বাঙলার লোকবৃত্ত চর্চার একটি বিশেষ অঙ্গ। এই লোকসঙ্গীতকে হৃদয় ও বুদ্ধির সাথে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হ'লে সমগ্র বাঙালী জীবনের আদিমরূপটি, ঐতিহ্য ও তার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস অনুধাবন করা প্রয়োজন। কারণ কোন জাতির জীবনপ্রবাহ আর গতিপ্রকৃতির পরিচিতি ছাড়া সেই জাতির লোকবৃত্তকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সমতলভূমির নিস্তরঙ্গ নদীতটে ব'সে প্রবহমানা নদীর অখণ্ড জীবনবৃত্ত উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য। সারি সারি পর্বতমালার মাঝে তার উৎসটিকে অনুসন্ধান করতে হ'বে।

আজকের সমাজ উচ্চকোটির মানবজীবনের ভোগসুখের স্বার্থে বহুধাবিভক্ত। মধ্যযুগ হ'তে বাঙলার সমাজ জীবনে যে রাষ্ট্রবিন্যাস তা' ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মর্য্যাদা রক্ষায় ও তার প্রসারলাভে আনুগত্য দেখিয়েছে। অথচ লোকসংস্কৃতিরক্ষায শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তেমন কোন অনুরাগ এযাবৎ প্রকাশ পায় নি। বুদ্ধিজীবীর কূটকৌশলে পরবর্তীকালে যে বর্ণ বা শ্রেণীবিন্যাস তার ফলে অর্থনৈতিক মূলধন কেন্দ্রীভূত হ'য়েছে যেখানে—সেখানে লোকসংস্কৃতি অনেকের অনুকম্পার বিষয়বস্তু। উৎপাদনের অসম বণ্টন ব্যবস্থায় ও বিকল্প জীবিকায় ক্ষেত্রে অপ্রতিরোধ্য প্রতিকূলতায় আজকের সমাজ জীবন বহুধা বিভক্ত। বেঁচে থাকার চিরন্তন দাবীতে একে অপরের অধিকারকে দাবিয়ে রেখেছে। এহেন পটভূমিকায় লোক-সঙ্গীতের ইতিহাস বিচার করতে হ'বে। গণচেতনায় সমৃদ্ধ ধর্ম ও হৃদয়ভিত্তিক সেই অবিভক্ত আদিম সমাজের মাঝেই লুকিয়ে আছে লোকসঙ্গীতের প্রাণপ্রবাহিনী উৎসধারা।

এই দেশের লোকসংস্কৃতির ইতিহাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বাঙলাদেশ সমগ্র ভারতের উত্তর-পূর্বপ্রান্ত দেশ। যখন সারা ভারত জুড়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাবল্য তখন সেই প্রাচীন আর্য্যেতর সভ্যতা আপন গৌরবে উজ্জ্বল। বাঙলাদেশে আর্য্যীকরণ সুরু হয় সবার শেষে। আর্য্য সংস্কৃতির তরঙ্গ বিক্ষোভ যখন বাঙলাদেশের তটভূমিতে এসে ধাক্কা দিয়েছে তখন উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশে এই ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত। বাঙলাদেশ তখন আর্য্যপূর্ব কৌমসভ্যতা, সংহতি ও আত্মবিশ্বাসের বলে একটি নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। উত্তর ভারতের আর্য্যভাষাভাষী সম্প্রদায় বাঙলাদেশে শিকারজীবী ও অরণ্যচারী কোমদের বল্‌তো 'ম্লেচ্ছ', 'দস্যু'; আর ওদের ভাষাকে বলতো 'অসুরের ভাষা'। উচ্চকোটির মানুষ ওদের দেখতো ঘৃণার চোখে। ওরাও আর্য্য সম্প্রদায়কে দেখতো অশ্রদ্ধা আর সন্দেহের চোখে। তাই প্রবল বিরোধ আর সংঘর্ষের মধ্যে হয় বাঙলাদেশে আর্য্যীকরণের জন্ম। আর্য্যপূর্ব সংস্কৃতি ছিল তখন গভীর ও ব্যাপক। জাতির অন্তরের সাথে ছিল তার নিবিড় যোগ। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী সংঘর্ষ চলেছে। গুপ্ত যুগের পূর্ব পর্য্যন্ত আর্য্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার বা বর্ণবিন্যাস এ দেশের সমাজে তেমন স্বীকৃতি লাভ করে নি। এ দেশের মানুষ তখনও তার নিজস্ব ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি নিয়ে কালাতিপাত করেছে। একাদশ দ্বাদশ শতক অবধি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাঙালী সমাজ জীবনের শুধু উচ্চকোটিতেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে নয়। ফলে রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক অসম বিন্যাস দেখা দিয়েছিল। সমাজের এক অংশে যখন উপনিষদ আর ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচলন, উচ্চতর মননশক্তির চর্চা, যাগযজ্ঞ ও আহুতির প্রচলন, অন্য অংশে তখনও আধিভৌতিক মতবাদ, বৃক্ষপূজা আর যাদুশক্তিতে অকৃত্রিম বিশ্বাস। 'ইতিহাসের এই অসম গতি' বাঙালী জীবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

বাঙলার লোকবৃত্ত চর্চার যে বিভিন্ন ধারা যথা ব্রত, ছড়া, কথা, গাথা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি আজও প্রবহমান তা মূলতঃ সমাজের অন্দর-মহলে ও নিম্নকোটির সমাজ জীবনে সীমাবদ্ধ। উচ্চকোটির পুরুষ জীবনে লোকসংস্কৃতি সম্পূর্ণই অপাংক্তেয় উপর্য্যুক্ত দুই স্তরের ব্যবহারিক জীবনের আচারে, ধর্মে, ভাবনা কল্পনায় সেই আর্য্যপূর্ব সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণার চর্চা চলেছে। লোকবৃত্তের অন্যতম শাখা লোকসঙ্গীতেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

বাঙলার উচ্চবর্ণের সমাজ জীবনে সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা হ'য়েছে, বিজ্ঞানের প্রসারলাভ ঘটেছে, জীবনধারণের কৌশল হ'য়েছে অনেক উন্নত। কিন্তু এর কোন

প্রভাবই লোকবৃত্তের গতিকে রুদ্ধ করে দিতে পারে নি। বরং কখনও কখনও আপন সমাজ ও ধর্ম রক্ষার প্রয়োজনে কিছু কিছু গ্রহণ ও বর্জন করেছে। বাঙালীর ইতিহাসের বৈচিত্র্য এই যে—সংস্কৃতির এই দুই ধারা প্রায় গুপ্তযুগ হ'তে আজ পর্যান্ত সমান্তরালভাবে প্রবহমান। যদিও রাষ্ট্রীয় বা উচ্চকোটি সমাজের আনুকূল্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারা ক্রমশঃ স্ফীত হ'য়েছে। এবং বুদ্ধিদীপ্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সাথে লোকবৃত্ত চর্চার ধারাটিকে একাঙ্গীকরণ করা সম্ভব হয় নি। লৌকিক দেবদেবী, গাছ, পাথর আর যাদুতে বিশ্বাসের নানারূপ নানাভাবে প্রতিফলিত হ'য়েছে লোকসঙ্গীত ও নৃত্যে। পালপার্বণে সেই আদিম কোমবদ্ধ মানব জীবনের ধ্যান-ধারণা। পরবর্তীকালে সমাজের এলাকা বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবিকার এলাকাও সম্প্রসারিত হ'য়েছে। কিন্তু সম্প্রসারিত জীবিকার কোন ক্ষেত্রেই গণ-জীবনের সেই আদিম সংস্কারটিকে অবহেলা করতে পারে নি।

বাঙালী জীবনে ধর্মবিশ্বাসের সাথে সংস্কৃতির যোগ নিগূঢ়। যেহেতু আর্য্য-ব্রাহ্মণ্যধর্ম সমাজের উচ্চতম স্তর ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেহেতু শত শত বছরের প্রচেষ্টাসত্ত্বেও এ ধর্ম তার মূল সমাজের অন্তরে বা লৌকিক শ্রেণীর মধ্যে প্রসারলাভ করতে পারে নি। ঠিক সেই কারণেই বাঙলার লোকসঙ্গীত তথা লোকবৃত্তকে শিক্ষিত ও সংস্কৃত মানুষ সহৃদয়চিত্তে গ্রহণ করতে পারে নি। অনেক সময় বাধ্য হয়ে কর্তারা মাঝে মাঝে অনুকম্পার দৃষ্টি হেনেছেন কিন্তু তাঁদের নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশাধিকার দেননি।

মূলতঃ যে কারণ সমূহের জন্য এই দুই সংস্কৃতির সমীকরণ সম্ভব হয়নি—তা হচ্ছে—প্রথমতঃ, বাঙলাদেশে আর্য্যধর্মের প্রভাব এসেছে সবশেষে। দ্বিতীয়তঃ, আর্য্য সভ্যতার যে প্রবাহটি এসেছে তা' শক্তির দিক হ'তে তৎকালীন কৌম সভ্যতার শক্তির তুলনায় ছিল অনেকাংশে দুর্বল। তৃতীয়তঃ, উভয় সংস্কৃতি পরস্পর পরস্পরকে সংশয় ও অবিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করেছে। আর্য্য মানসের শিক্ষাভিমান ও উন্নাসিকতা, আর্য্যেতর সম্প্রদায়ের আর্য্য ধর্মে শ্রদ্ধার অভাব উভয়কেই দূরে সরিয়ে রেখেছে। সংকীর্ণ গণ্ডির মাঝে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শুচিতা রক্ষা আর তার মাঝেই প্রসার। সমাজের বৃহত্তর গণজীবন সম্পর্কে কোনদিনই উদার মনোভাব গ্রহণে সহায়তা করে নি। চতুর্থতঃ, বাংলাদেশে নানা বর্ণ মিশ্রণের ফলে ও নানা ঐতিহাসিক কারণে জাতিভেদ আর্য্য ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় শিথিল। সমাজবদ্ধতার সুরু হ'তেই এখানে শূদ্রদের সংখ্যাধিক্য। আর্য্য-ভারত সনাতনত্বের আদর্শে স্থির। সামাজিক বিধিবদ্ধতা ও কঠোর নিষ্ঠাচার হ'তে আর্য্য ভারতের

কখনও বিচ্যুতি ঘটে নি। বাঙলার ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভিন্ন সময়ে ঐতিহাসিক কারণেই নানা ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে। মাঝে মাঝে বৈপ্লবিক আলোড়নের ফলে নানা বিপরীতধর্মী মতবাদের সহাবস্থান সম্ভব হয়েছে। উত্তর-রাঢ় জনপদের গ্রামে গ্রামে এর প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। বাঙলার লোকসঙ্গীত তথা লোক-বৃত্ত সকলকে গ্রহণ করে নিজের ভাবে নিজের মনের মত করে গড়ে নিয়েছে। কৌমজীবনে লোকবৃত্তের সুপ্রাচীন ধারাটিই বাঙালীকে সেই দুর্মদ প্রাণশক্তি জুগিয়েছে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাধনায় ও বাউলের সহজিয়াতত্ত্বে যে প্রাণবন্ত হৃদয়াবেগ—তা এই আদিপর্বেরই উত্তরাধিকার। সঙ্গীতে, নৃত্যে, ভাবে, কল্পনায় আর্য্যেতর ধ্যানধারণা আজকের বাঙালী সমাজকে দিয়েছে ভালবাসা আর বিশ্বাসের অধিকাব।

ইতিহাসের সত্য এই যে পৃথিবীর সব শিক্ষিত, সভ্য ও সংস্কৃত সম্প্রদায়ই তাদের নিজধর্ম ও মতামত অনুন্নত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ে মাঝে নানা কলাকৌশলে চালিয়ে দিতে চায়। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতিকে একেবারে নিঃশেষ করে দিতে চায়। কিন্তু বাঙালীর কৌমসংস্কৃতি উন্নত সংস্কৃতিকে চরম ঔদাসীন্যে অস্বীকার করেছে। অবহেলা করেছে আর্য্যসংস্কৃতিকে। তাই আজও বাঙলার লোকসংস্কৃতি অর্থনীতির দুঃসহ চাপকে উপেক্ষা করে টিকে রয়েছে।

রূপরেখা

লোকসঙ্গীত গ্রামদেশেই সীমাবদ্ধ। গ্রাম জীবনের ভাব আর ভাবনাই এই সঙ্গীতে ফুটে উঠে। গ্রামদেশের সহজ সরল অর্ধশিক্ষিত মানুষই এর দরদী শ্রোতা। লোকসঙ্গীত ওদের পরমপ্রিয় সম্পদ। সভ্যতার আদিপর্বে যখন লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি—তখন বাঙালীর জীবন ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। এই গ্রামেরই পথে প্রান্তরে বাঙালী জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান ধারণার রূপ পরিগ্রহ করে। তাই বাঙালী সংস্কৃতির একটি শাখা লোকসঙ্গীতের রূপ গ্রামীণ। কৌমজীবনের গোষ্ঠীবদ্ধতা এই গ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। লোকসঙ্গীতেব ধারক ও বাহক যে কৌমসংস্কৃতি তা গ্রামভিত্তিক—তাই লোকসঙ্গীতের উৎস গ্রামজীবন।

এই গ্রামকেন্দ্রিকতার মূল কারণ আর্য্যপূর্ব সমাজ জীবনে ধনোৎপাদনের ও বণ্টনের পদ্ধতি। মূলতঃ কৃষি ও অবসর সময়ে শিকার ও কুটিরশিল্পই ছিল তৎকালীন উপজীবিকা। যারা কুটিরশিল্পে আত্মনিয়োগ করেছিল তারাও মূলতঃ কৃষক। আর শিকারের জন্য খালবিল, নদীনালা, ঝোপজঙ্গল ও কৃষির জন্য

মাঠ নিয়েই কৌমবদ্ধ জীবন হয়েছিল ক্রমপ্রসারিত। কৃষিকার্য্য ভূমি-নির্ভর। এই ভূমি অনড় ও নিশ্চল অবস্থায় গ্রামদেশেই সীমাবদ্ধ। তাই কৃষি-নির্ভরতা, ভূমি নির্ভরতায় বা গ্রাম নির্ভরতায় পর্য্যবসিত হ'য়েছে। বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া গ্রামের বাইরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ গ্রামেই পাওয়া যেত জীবিকা ও জীবনধারণেব সামগ্রিক উপাদান। গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। পরবর্তীকালে বাণিজ্যের প্রসারলাভ ঘটেছে। কৃষিপদ্ধতি হ'য়েছে অনেক উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত। যন্ত্রশিল্পের ব্যাপকতা কৃষি-নির্ভরতাকে অনেকাংশে সঙ্কুচিত করেছে। তথাপি কৌমসংস্কৃতির সেই আদিমধারাটি আজও সমাজ সভ্যতায় প্রসারিত। আজও বাঙালী সভ্যতা গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষিনির্ভর।

সমাজ বা রাষ্ট্রবিন্যাসে বর্ণ বা শ্রেণীবিন্যাস প্রাধান্যলাভ করেছে। দেশের সম্পদের অধিকাংশ পরিমাণ যে শ্রেণীর সাহায্যে আসত না—রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক অধিকারে তাদের ভূমিকা ছিল সামান্যই। উপরন্তু সমাজের উচ্চবর্ণের অহেতুক ঔদাসীন্যের ফলে লোকবৃত্ত চর্চা ক্রমাবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন। তবু লোকসমাজে প্রাণের যে দুর্বার আবেগ আছে, দুর্মদ প্রাণশক্তি আছে, তাই উচ্চবর্ণের অসহযোগিতাকে উপেক্ষা করে লোকসঙ্গীত তথা লোকবৃত্ত চর্চাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে উৎসাহ জুগিয়েছে। কোন অর্থ নৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য বা সামাজিক অবহেলা গণজীবনেব আনন্দোৎসব ও বিশ্বাসের সেই অফুরন্ত শক্তির উৎসটিকে শুকিয়ে যেতে দেয় নি। লোকসঙ্গীতের গ্রাম-কেন্দ্রিকতার মাধ্যমে আজও সেই ধারা অব্যাহত, গতিবেগ ক্ষীণ হ'য়েছে যদিও।

উৎস

প্রাচীন কৌমজীবনের বেঁচে থাকার কৌশল ও জীবনদর্শনেই লোকসঙ্গীতের উৎস। বেঁচে থাকার মূলে ছিল সন্তান ও শস্য কামনা; আর জীবনদর্শনে ছিল অপরিসীম যাদুবিশ্বাস। উৎসবে, সঙ্গীতে, নৃত্যে তারই বিচিত্র প্রকাশ। শুধু অলস অবসর বিনোদনের জন্য লোকসঙ্গীত তথা লোকসংস্কৃতির সৃষ্টি হয় নি—সৃষ্টি হ'য়েছে অস্তিত্ব রক্ষার আদিম আগ্রহেও। লোকসঙ্গীত নিছক শিল্পচর্চার দাবী নিয়ে জন্মলাভ ক'রে নি। একথা ঠিক যে লোকসঙ্গীত পরবর্তীকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামজীবনের গতানুগতিকতা হ'তে বৈচিত্র্যের আনন্দলোকে মানসিক উত্তরণে সাহায্য করেছে—উপলক্ষ্য শুধু যে কোন পূজা বা উৎসব।

সৃষ্টি কামনার অন্যতম দাবী নিয়ে লোকবৃত্তের উৎপত্তি। লোকসঙ্গীতের

মূলেও রয়েছে সৃষ্টির কামনা ও অকৃত্রিম যাদুবিশ্বাস। যাদুবিশ্বাসের জন্ম হ'য়েছে কামনার দুর্মদ আবেগ হ'তে। লোকসঙ্গীতে আছে সেই কামনা সফল করার প্রচেষ্টা। আজকের উন্নত ও শিক্ষিত মানসিকতা যদি এই যাদুবিশ্বাসকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচারবিশ্লেষণ করেন তাহ'লে অবশ্যই এই জাতীয় বিশ্বাসকে মূর্খ ও অন্ধ সংস্কার মাত্র ব'লেই গণ্য করতে কুণ্ঠিত হবেন। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অনার্য্য সংস্কৃতি উন্নত মানসিকতায় উজ্জ্বল নয়। কিন্তু তাদের এই অন্ধধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার তাদের মনে এক অকল্পনীয় দৃঢ়তা এনে দিয়েছিল। লোকসঙ্গীত ও নৃত্যে এই বিশ্বাসের প্রভাব ছড়িয়ে আছে। সভ্যতার আদিপর্বে শস্যোৎপাদনের বৈজ্ঞানিক কৌশল ছিল অনায়ত্ত। যন্ত্রের ব্যবহার ছিল সীমিত। আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করার কৌশল ছিল অজ্ঞাত। তখন যে কোন শস্যোৎপাদককেই ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় জীবনধারণের ক্ষেত্রে যে অসহায়তা—তাই তৎকালীন বাঙালী জীবনকে যাদুবিশ্বাসের আশ্রয়ে নিয়ে গিয়েছিল। শস্যোৎপাদনের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম—তার সার্থক পরিণতির জন্য হয়ত স্বপ্নের প্রয়োজন ছিল। এই স্বপ্ন সাফল্যই মানুষকে অধিকতর পরিশ্রমে উৎসাহ জুগিয়েছে ও জুগিয়ে চলেছে। এ স্বপ্ন কামনায় থরোথরো। সিদ্ধিলাভই কামনার অন্যতম ফলশ্রুতি। কোন কারণেই মানুষ তার সাধের স্বপ্নকে নষ্ট হ'তে দিতে চায় না। কোন মানুষই চায় না বর্তমানের সমস্ত পরিশ্রম কোন অজ্ঞাত অন্ধকারের গর্ভে বিলীন হ'য়ে যাক্। এই কামনাকে লোকমানস স্বপ্ন কল্পনায় ফুটিয়ে তুলতো নৃত্যগীতের মাধ্যমে। পূজা অর্চনার মাধ্যমে, বৃক্ষপূজার চলন তখন থেকেই। *

কোমজীবনের কামনা ছিল মূলতঃ দুইটি—প্রথমটি সন্তান, দ্বিতীয়টি শস্য। এই দুই কামনাই লোকবৃত্তের আদিপর্বকে পরিচালিত করেছে। যাদুবিশ্বাস একের কামনা অন্যকে প্রভাবিত করেছে। কৌম সভ্যতার যাবতীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও উৎসবে সেই কামনারই অভিব্যক্তি। বিভিন্ন পূজাপার্বণ উদ্‌যাপনের আনন্দেও সেই কামনারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিফলন।

পরবর্তীকালে আর্য্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশীর্বাদধন্য তথাকথিত উচ্চকোটি মানব এই কামনা আর যাদু বিশ্বাসকে ব্যঙ্গ করেছে তাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও

বস্তুনিষ্ঠা দিয়ে। প্রায়শই লোকবৃত্তচর্চার সাথে কোন সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন বোধ করে নি। অথচ মানুষের প্রকৃতিগত গুণই এই যে তার নিজস্ব বিশ্বাস ও সংস্কারকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকা। তাই আর্য্য ধর্ম প্রসার লাভের পরও লোকায়ত আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি নৃত্যগীত, কোন কিছুই বঙ্গজীবন থেকে লুপ্ত হয়ে যায় নি।

প্রাচীন সমাজ জীবন প্রাকৃতিক নিয়মের মাত্রাহীন ক্ষমতায় বিশ্বাসী। তাদের স্থির বিশ্বাস ছিল মানুষের ক্ষমতায় এই শক্তিকে রোধ করা সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি প্রাকৃতিক শক্তিতে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কোন দৈবদুর্য্যোগকে দেবতার রোষ বা অভিশাপ বলেই মেনে নেওয়া হতো। বিশ্বাস করতো নৃত্যগীতের মাধ্যমেই সৃষ্টিকর্তার মনোরঞ্জন করা যাবে। ঈশ্বর তুষ্ট হ'লেই আসবে ফসলের প্রাচুর্য্য। তাই নৃত্যগীতের মাঝেই ফুল ফোটানোর আর ফসল ফলানোর ইঙ্গিত। যদি নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত না হয়—কিংবা অনুষ্ঠানে আন্তরিকতা বা শুচিতার অভাব ঘটে—তা'হলে বিধাতার রোষ নেমে আসবে। ব্যর্থ হবে শস্য আর সন্তান কামনা। দেশ জুড়ে নেমে আসবে দুর্ভিক্ষ আর হাহাকার। যা এক দুঃস্বপ্ন।

প্রাকৃতিক শক্তির কাছে অসহায়, দুর্বল মানুষ চায় কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে। যাদুবিশ্বাসই সেই আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক শক্তি অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই যাদুবিশ্বাসের প্রভাব সমাজ হতে মুছে তো যায়ই নি বরং ব্রতে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, আচার অনুষ্ঠানে আজও এর প্রভাব রয়েছে। কোন একটি আন্তরিক বিশ্বাস জাতির জীবন হতে মুছে যেতে সুদীর্ঘ সময় লাগে—তা যদি ভ্রান্ত হয় তবুও।

'ম্যাজিকের মূলে আছে মনের ভাবানুসঙ্গের ক্ষমতা। এই মতবাদ হাতেকলমে পরীক্ষিত ও সমর্থিত হয়েছে আদিম অধিবাসীদের জীবন হ'তে। মানব সংস্কৃতির বস্তুগত দিক হতে যেমন একটা প্রস্তর যুগ আছে তেমনি মনীষার (intellect) দিকে রয়েছে একটি ম্যাজিক যুগ। ম্যাজিকের নেতিবাচক দিকটাকে বিকশিত করলো ধর্ম, আর ইতিবাচক দিকটাকে বিজ্ঞান। আদি বিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই পুরোহিত। তাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়েছিল ম্যাজিকের চিন্তাধারায়।'

লোকসঙ্গীত বা নৃত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একক নয়, যৌথ। এ অনুষ্ঠানে ব্যষ্টিসত্তার কোন মূল্য নেই। সমষ্টিগতভাবে নৃত্যগীত করবে, জানাবে তাদের মনের কামনা। সমগ্র গোষ্ঠীর একটি সামগ্রিকরূপ ফুটে উঠে নৃত্য, গীত, আর আচার অনুষ্ঠানে; সারা গোষ্ঠী বা জনপদের জন্য সকলে মেতে উঠে। সকলের প্রাণের স্পর্শ পেয়ে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করার বৃথা চেষ্টায় জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হবে এই ছিল বিশ্বাস। নৃত্য, গীত আর ম্যাজিকের ক্ষমতায় প্রাকৃতিক শক্তিকে তুষ্ট করে বশে আনতে পারলেই জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাবে। তাই প্রকৃতির অন্যতম সৃষ্টি বৃক্ষকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়েছে নানা অনুষ্ঠান। বৃক্ষ অনেকক্ষেত্রে লোকসঙ্গীতের বিষয়বস্তু। বীজ বপনের সময় হতে ফসল উঠার সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন পর্য্যায়ে যে অনুষ্ঠান তাকে কেন্দ্র করে আছে আদিম লোকসঙ্গীত। বৃষ্টির অনুকরণে ঘড়ায় করে জল ছিটিয়ে দিলেই ফসলের প্রাচুর্য্য আসবে এই ধারণা। 'ভাঁজো লো কলকলানী মাটি লো সত্তা—'। ভাঁজো উৎসবে মেয়েরা মেতে উঠে নিছক আনন্দ প্রকাশের জন্য নয়, তাদের বিশ্বাস এই গানের মাধ্যমেই ভাঁজো কলকলিয়ে উঠবে—সারা মাঠ জুড়ে পড়বে প্রয়োজনীয় বৃষ্টি, দেখা দেবে অফুরন্ত ফসল। *

কামনার কথা

লোকসঙ্গীতের উৎস প্রসঙ্গে একটি কথা বলা হয়েছে। কথাটি কোমজীবনের দুইটি কামনা—একটি সন্তানের, অপরটি শস্যের, যা সভ্যতার আদিপর্বে লোকসংস্কৃতিকে জন্ম দিয়েছে ও পুষ্টিসাধনের চেষ্টা করেছে। সন্তানের কামনা লোকবৃত্তের অন্যান্য শাখা যেমন ব্রত, ছড়া ও উৎসবে ও মেয়েলী অনুষ্ঠানে দেখা গেলেও লোকসঙ্গীতে এই কামনা অনেকক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত। যদিও একথা সত্য যে, সঙ্গীত সংগ্রহকালে এই জনপদে অন্ত্যজশ্রেণী যেমন বাউড়ী, বাগ্দী, ডোম, ঢ্যাকড়া, ঘাটোয়াল আর আদিবাসীদের পারিবারিক বা সামাজিক উৎসবে বিশেষ করে বিবাহকালে এমন বেশ কিছু গান শুনেছি যার অর্থ মেয়েরা কেন, পুরুষেরাও বলতে দ্বিধা প্রকাশ করেছে। মেয়েরা দলবদ্ধভাবে নেশায় বিভোর হয়ে অবলীলাক্রমে নরনারীর যে দেহগত মিলনের কথা গানের কথায় গেয়ে চলে তার মাধ্যমে তাদের চোখে মুখে যৌনমিলনের কামনাবাসনা ফুটে উঠে। সেই অভিব্যক্তি শিক্ষিত রুচিতে অশ্লীলতা দুষ্ট মনে হতে পারে কিন্তু তা দুষ্ট ব্যভিচার নয়। এ গান তারা পুরুষের সামনে গেয়ে চলে। মিলনের কামনা, সন্তানের আকাঙ্ক্ষা ওরা আজও তাদের গানে আদিপর্বের উত্তরাধিকারসূত্রে টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু শ্লীলতার বিচারে সেই গান প্রকাশযোগ্য নয়।

সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে এই সন্তানের কামনার সাহিত্যরূপটি কেন লোকসঙ্গীতে এল না—তা গবেষণার বিষয়। জানি না বাঙলাদেশের অন্য কোন অঞ্চলে লোকসঙ্গীতে সন্তানকামনার কথা সরাসরি ব্যক্ত হয়েছে কিনা।

আলোচ্য গ্রন্থের সংগৃহীত লোকসঙ্গীতে যদি সন্তানকামনার অভিব্যক্তি না থাকে তাহ'লে প্রশ্ন উঠতে পারে এই সঙ্গীতের আলোচনায় দু'টি কামনার কথা কেন বলা হ'ল? তার প্রথম ও প্রধান কারণ লোকবৃত্তের প্রতিটি ধারা আদিপর্ব হ'তে আজ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উভয়কোটির সমাজ জীবনে বিশেষত নারী সমাজের মাঝেই ব্যাপ্তিলাভ করেছে। অন্তঃপুরবাসিনীরাই নিষ্ঠার সাথে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয় আলোড়নের মাঝেও এর মূলগত রূপটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অবিশ্রান্ত আন্তরিকতা ও হৃদয়বত্তা নিয়ে তারা স্বীয় পবিত্র দায়িত্ব পালন করে চলেছে। প্রাগৈতেহাসিক যুগ হ'তে কয়েকদশক আগে পর্য্যন্ত শস্য উৎপাদন পদ্ধতির চিরাচরিত ধারা, যা আদিপর্বে শুধু নারীদের ও পরবর্তীযুগে নারীপুরুষ উভয়েরই অধিকারে, তাই সমগ্র নারীজাতিকে এই সংস্কৃতি চর্চায় ও রক্ষণাবেক্ষণে সাহস জুগিয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। মালিকেরও রূপ বদলেছে সত্য। কিন্তু কর্ষণ ও বণ্টন পদ্ধতির তেমন কোন পরিবর্তন এখনও আসে নি। তা ছাড়া সৃষ্টির আদিকাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত অন্-আর্য্য দেবদেবীর মাঝে মাতৃকাতন্ত্রের প্রাধান্য। শক্তিপূজার প্রতি বাঙালী জাতির দুর্বোধ্য আকর্ষণ। আর্য্য দেবদেবী শুধু উচ্চকোটি সমাজেই পূজিত। কিন্তু গ্রাম্য দেবদেবী বা গণদেবতার ক্ষেত্রে অন্-আর্য্য দেবদেবীই স্বাঙ্গীকৃত হয়েছে। আর এই পূজার জন্য—পূজোপচার সাজানো, উৎসবের প্রস্তুতি, ধর্ম্মীয় নিষ্ঠা, নৃত্য, গীত—এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই মেয়েদের প্রধান ভূমিকা।

সমাজের সমগ্র কামনা বাসনাকে লোকবৃত্তই তার বিভিন্ন ধারায় প্রতিফলিত করেছে। সৃষ্টির আদিমকাল হ'তে মেয়েরাই যদি এই সংস্কৃতিকে বাইরের প্রবল ঝড়ঝাপ্‌টা সত্ত্বেও টিকিয়ে রাখার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে থাকে তাহলে এই সংস্কৃতির সাথে তাদের নিশ্চিতই অন্তরের যোগাযোগ। আর একথাও অনস্বীকার্য্য যে মিলনের কামনা—সন্তানের কামনা—মেয়েদের চিরন্তন ও আদিম কামনা। তাই সঙ্গত কারণেই একথা মেনে নেওয়া যায় যে লোকসংস্কৃতির সৃষ্টিমূলে মেয়েদের সন্তানকামনা অবশ্যই ছিল। এর প্রকাশ লোকসংস্কৃতির অন্যান্য ধারায় আজও ঘটছে। অসংখ্য প্রেমগীতির মাঝে মিলনের কামনা আজও

সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা—যা এদেশের লোকসঙ্গীতের একটি মুখ্য উপাদান—তার বাহ্যিক আবরণটি উন্মোচন করলেও গায়ক গায়িকার কামনা বাসনা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। রাধাকৃষ্ণ তথা প্রতিটি দেবদেবীর লীলাবৈচিত্র্যের লৌকিক রূপ দেওয়া হয় তার কারণ সমাজের সুখ দুঃখ, অতৃপ্ত কামনা বাসনা সবই এরই মাঝে ফুটে উঠে। দেবদেবার বৈদিকরূপটি এখানে অন্তর্হিত। এ দেবদেবী তাদের সংসারের আপনজন, ঘরের মেয়ে, স্নেহশীলা মা—কখনও বা পরাণসখা। গানে সেই মিলনের প্রকাশ, কখনও বা অধীর আকুতি যেমন—

পন্থ ছাড়ো কালা
এবার হইল ঘর যাবার বেলা।
শুন শুন কারিগর
গায়ে দিব আবরণ
পন্থ ছাড়ো কালা।

অথবা পলাশ বনে ভাই রঙ ছড়াইলো কে
রঙীণ দেশের রঙীণ বধূ তারে এনে দে।

বা ফুটল গোলাপ রে—ভমরা চষাল
পাতা ছিল, কুঁড়ি ছিল—ফুল ফুটালো।

অথবা জ্বেলে আগুন পালিয়ে গেলি নিভায়ে গেলি না রে কালা
ভাঙা তরী ডুবিয়ে দিলি ধর্ম্ম রাখলি না রে কালা
না হয় নিজের মন নিজেই বুঝাতো রে কালা
পানে তো মরবো না কালা।

শস্যের কামনা ব্রতে, ছড়ায়, উপকথায়, নৃত্য আর গীতে অনিবার্য্য কারণেই উপস্থিত। ইতিহাসের সুরু হতে আধুনিককাল পর্য্যন্ত দেশের সমাজনীতি ও অর্থনীতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে ভূমি একমাত্র ও বর্তমানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। বাঙলাদেশ তথা ভারত মূলতঃ গ্রামকেন্দ্রিক—আর তাই কৃষিকেন্দ্রিক। মাঝে কিছুকাল বাণিজ্য নির্ভরতা এবং গত দুই শতক হতে আংশিক শিল্পনির্ভরতা দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করলেও আজও ভূমিই সামগ্রিক অর্থনীতির রথ-চক্রের মূল রজ্জুটাকে টেনে ধরে রেখেছে। তাই সভ্যতার আদিপর্ব হতে ভূমি আর উৎপাদনের সাথে সমাজের সর্বস্তরের, বিশেষ করে অন্ত্যজশ্রেণীর, যারা লোকবৃত্তের মূল ধারক ও বাহক, তাদের জীবিকা ও জীবনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। শস্যহানির সাথে তাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। উৎপাদন আশাপ্রদ হলে তাদের

সারা বছরের রঙীন স্বপ্ন; কামনা বাসনা সফল হবে—বেঁচে থাকার আনন্দ অব্যাহত থাকবে। তাই যে ভূমি আর ফসলকে নিয়ে তাদের চাওয়া পাওয়া, আশানিরাশার দ্বন্দ্ব, ভবিষ্যতের রূপকল্পনা ও স্বপ্নের জাল বোনা লোকবৃত্তের প্রতিটি ধারায় তার কথা তো থাকবেই। বিশেষ করে আদিপর্বে যখন উৎপাদনের কৌশল ছিল অনায়ত্ত, প্রয়োজন ও সময়ানুযায়ী জল ছিল অনিশ্চিত, তখন রুক্ষ কঠোর মৃত্তিকার বুকে ফসলের স্বপ্ন নিয়ে অপরিসীম ও অকল্পনীয় পরিশ্রমের পর যে কোন ব্যর্থতাই যে কত বেদনাবহ তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাই সংস্কারে, বিশ্বাসে, ধর্মচর্চ্চায়, পূজাপার্বনে, উৎসবে, নৃত্যগীতে সর্বত্রই সেই শস্যের কামনা। এই কামনা বৈদিক দেবদেবী যেমন বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতির পূজার মধ্যে ও প্রকট।

অন্ত্যজ-শ্রেণীর ক্ষেত্রে বৃক্ষপূজা এসেছে করমপূজার মাধ্যমে। অম্বুবাচীর দিন ধরিত্রী ঋতুমতী হয়। আর সেদিনই এই পূজার সুরু। করমপূজার গানে, ভাঁজো ও ভাদুর গানে বৃষ্টিকে আহ্বান, শস্যের কামনা, সুন্দরভাবে ফুটে উঠে। জলপাইগুড়ির পার্বত্য অঞ্চলে অনাবৃষ্টির সময় রাজবংশী মেয়েরা বরুণ দেবতাকে 'হুদুমা' গান গেয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হতে আবেদন জানায়। বৃষ্টির জন্য এ আবেদন জানাতে দেখা যায়। বৈশাখের প্রথম দিক হতেই কিষাণ ঘরের মেয়েদের 'মেঘারাণীর কুলো' নামাতে দেখা যায়। কুলো, জলঘট নিয়ে গান গেয়ে তারা মেঘারাণীর ব্রত উদযাপন করে। বৃষ্টি না হ'লেই সুরু হয় চিন্তা। গানে যার প্রকাশ হয় এই জনপদে—

উপর দেশে জল হইল
নামো দেশে জল নাই
বাদ বেইহেড় সুকি গোয়ালা।

তাছাড়া মেঘ দেখে ভল্লা, ধাঙরেরা গান গায়—

কালো মেঘে আড়াল হ'তে ওলো
কার হাসি ফুটিল ফুটিল লো
মাঠে ঘাটে জল নাই ডাঙ্গাতে হ'ল সাঁতার
কাজলা মেঘে আড়াল হ'তে ওলো
কার হাসি ফুটিল।

অথবা

মাঠে ঘাটে জল নাই ভাই ডাঙ্গালে সাঁতার
কালো মেঘ কালো কেরেছে আঁধার।

অথবা আদিবাসীদের গানে—

সাহার দিলাম গোবর দিলাম কি ধান পুঁতলি
কি ধান পুঁতে লালেলা
মা বল্ হে রেষ্টমনি ধান রে
বাবহা বলে বৌলে ধান
কেরি কান্দার ধান।

পরিধি

লোকসঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে এই সঙ্গীত আদিপর্বে কৌমচেতনায়, মধ্য ও আধুনিক পর্বে শুধুমাত্র সর্বশ্রেণীর গোষ্ঠীচেতনায় সীমাবদ্ধ। ব্রত ও বরণ দুটি অনুষ্ঠানই মেয়েদের। দুটিতেই যাদু বিশ্বাসের সুস্পষ্ট প্রভাব। আদিপর্বের যাবতীয় অনুষ্ঠানে—যা' আধুনিকালেও প্রবহমান তা শুধু গীত আর নৃত্যে প্রতিফলিত। কোন পুরোহিত নেই। মেয়েরাই এই অনুষ্ঠানের পুরোহিত। এরাই সমষ্টিগতভাবে প্রতীকাকারে তাদের সন্তান কামনা ও শস্য কামনার কথা নৃত্যগীত আর ছড়ার মাধ্যমে ব্যক্ত করে। চরম শুচিতার সাথে অনুষ্ঠানের প্রতিটি কাজ পরিচালনা করে। বয়োজ্যেষ্ঠরাই মূল দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং মূলগায়েনের ভূমিকা নেয়। গ্রামের বাইরে কোন বৃক্ষতলে বা উন্মুক্ত ক্ষেত্রে ঈষৎ ঘন জঙ্গলের মাঝে, পাহাড়ের কোলে বা নদীর ধারে মিলিত হয় মেয়েরা। সমস্ত সমাজের কামনা বাসনার কথা গানের ভাষায় জানিয়ে দেয়।

মেয়েদের এই অধিকারের মূল কারণ হল প্রজননের ক্ষেত্রে মেয়েদের মূল ভূমিকা। শস্য ও সন্তান কামনায় এদের প্রচেষ্টাই কার্যাকরী ছিল। আদিপর্বে কৃষিকার্য্যে মেয়েদেরই ছিল প্রধান অধিকার। পরবর্তীকালে উন্নত কৌশলের ফলে কৃষিকার্য্য মেয়েদের হাত হ'তে পুরুষদের হাতে চলে গেলেও সেই নৃত্যগীত মুখরিত আদিম অনুষ্ঠান ও যাদুবিশ্বাস আজও সমানে চলছে। শত শত কামনা বাসনার সাথে মেয়েরা এই দুই প্রধান কামনার কথা তাদের ব্রতে, অনুষ্ঠানে, নৃত্যগীতের মাঝে নব নব রূপে প্রকাশ করেছে। পুরুষের কোন অভিভাবকত্বকেই তারা সেখানে মেনে নেয়নি। যুক্তিনিষ্ঠ পুরুষ কখনও এদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে নি বা অহেতুক যুক্তিজাল বিস্তার করে এদের হৃদয়াবেগকে ক্ষান্ত করেনি। বিবাহের রাত্রে বা পরদিন হিন্দু বরবধূকে বৈদিকমন্ত্রে মন্ত্রোচ্চারণ করান শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত। কিন্তু বিবাহের অনুষ্ঠান এতেই সাঙ্গ হয় না। মেয়েদের

হাতেই ছেড়ে দিতে হয় বরবধূকে। অন্দরমহলে মন্ত্রবিহীন মেয়েলী অনুষ্ঠান চলে। শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত মেয়েদের বিচিত্র রীতিনীতি। কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি হ'লে চলবে না। পুরুষের অনুশাসন সেখানে নিষিদ্ধ। ছড়া, গীত আর হাস্যপরিহাসই এদের মন্ত্র—এর মাঝেই আছে অকৃত্রিম যাদুবিশ্বাস আর কামনা।

স্মরণীয় যে, বাঙলাদেশে দেবের চেয়ে দেবীর প্রাধান্যই বেশী। অধিকাংশ দেবীর ক্ষেত্রেই ভয়ভক্তির প্রশ্ন বিজড়িত। মাতৃকাতন্ত্রের প্রাধান্য সেই কোমবদ্ধ জীবনাদর্শ হ'তেই সৃষ্ট বলে বহু পণ্ডিত মনে করেন।

'আর্য্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম আজও লোকায়ত অনার্য্য ধর্মকর্মের অনেক আচার অনুষ্ঠান, দেবদেবীকে ধীরে ধীরে নিজের কুক্ষিগত করিয়াছে কোথাও তাহাদের চেহারায় আমূল পরিবর্তন করিয়া—কোথাও একেবারে অবিকৃতরূপে। বাঙালীর ধর্ম-কর্মের গোড়াকার ইতিহাস রাঢ়, পুণ্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোমের এক কথায় বাঙলার আদিবাসীদেরই পূজা ও আচার, ভয় সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস।......যে ধর্ম-কর্মময়—সাংস্কৃতিক জীবন বাঙালীর গভীরে বিস্তৃত, যে জীবন নগরের সীমা অতিক্রম করিয়া গ্রামে কুটিরের কোনে, চাষীর মাঠে, গৃহস্থের আঙ্গিনায়, ফসলের ক্ষেতে, চণ্ডীমণ্ডপে, বারোয়ারী তলায়, নদীর ধারে, বটের ছায়ায়, জনহীন অন্ধকার অরণ্যে, নৃত্য সঙ্গীতে পূজা আরাধনার বিচিত্র আনন্দে, দুঃখ শোক মৃত্যুর বিচিত্র লীলায় বিস্তৃত।'

বৈশিষ্ট্য

শ্রুতি ও স্মৃতি লোকসঙ্গীতের অন্যতম সম্পদ। সিনেমা বা গ্রামফোনের গান গ্রামীন জনসাধারণের শ্রুতি বা স্মৃতিকে বর্তমানে অনেকাংশে যে সংক্রামিত করেছে—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সম্ভবত এই কারণেই লোকসঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে তা শ্রুতিনির্ভর। বিকল্পে পুঁথির ব্যবহার চলেছে। যুগের পর যুগ শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ও পরিবর্তিত হয় বলেই লোকসঙ্গীত অবিনাশী।

লোকসঙ্গীত মূলতঃ কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা হ'লেও কালক্রমে লোকের মুখে মুখে প্রচারের ফলে এই সঙ্গীত সমষ্টির সম্পত্তি হ'য়ে ওঠে। সমসাময়িক কালের রুচি ও পরিবেশ বুঝে গায়ক গান রচনা করেন। কিন্তু কালের ব্যবধানে ও মৌখিক প্রচারের ফলে তা পরিবর্তিত হয়। নতুন রূপ নেয় লোকসঙ্গীত।

আজকের যুগে শিক্ষিত ও উন্নত মানসিকতার বিচারে লোকসঙ্গীত পরিবেশনের ভঙ্গী বা ভাষা স্থূল মনে হ'তে পারে, কিন্তু এই সঙ্গীতের যে অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা অগণিত সরল শ্রোতৃমণ্ডলীকে অবিশ্বাস্যভাবে পুলকিত করে তা নিশ্চয়ই স্থূল নয়। কালের পরিমাপে লোকসঙ্গীতের বিচার বোধহয় নিরর্থক। সমসাময়িক ঘটনার প্রভাব লোকসঙ্গীতের বহিরঙ্গ রূপে পরিবর্তন আনে একথা সত্য, কিন্তু ভাবগত বিষয়ে যে কেন্দ্রীয় ঐক্য তা' কাল হ'তে কালান্তরে প্রবহমান। নিরক্ষর সহজ, সরল, গ্রাম্য শ্রোতা সঙ্গীতের তথ্য ও তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য প্রায়শই চেষ্টা করে না। এই অনুপলব্ধি তাদের রস গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।

শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে লোকসঙ্গীতের লিখিত রূপের প্রচলন অসম্ভব নয়। লোকসঙ্গীত লিখিত হলেই যে তার বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হবে একথা বোধহয় ঠিক নয়। লিখিত রূপের সুবিধের দিক হল যে, এই মৌখিক প্রচারের মধ্যে যে বিকৃতি বা অবলুপ্তির সম্ভাবনা থাকে—তা রোধ করা যায়। কিন্তু অসুবিধের দিক হল এই যে এর ফলে লিখিত গান নিয়েই গায়ক সম্প্রদায় তৃপ্ত থাকবেন। নতুন সৃষ্টির উৎসাহ প্রায়শই পাবেন না। ফলে সম্পদের প্রসারলাভ ঘটবে না। দ্বিতীয়তঃ গায়ক এই গানের ক্রমোন্নতি সাধনের সুযোগ পাবেন না। মৌখিক রূপের ক্ষেত্রে যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি স্বাধীনতা তা লিখিত রূপের ক্ষেত্রে থাকে না। সমষ্টির আবেগে রসসিক্ত যে রূপ, সমষ্টির চেতনায় উদ্বুদ্ধ যে সত্ত্বা, সমষ্টির আনন্দের অনুকূলে যে সৃষ্টি বৈচিত্র্য তা অন্য কোন সঙ্গীতে দুর্লভ। পরিবর্তনশীল বলেই লোকসঙ্গীত চির নতুন।

পরবর্তীকালে শিক্ষিত সমাজের যে বিশেষ অনুরাগ লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে তার মাঝে হৃদয়াবেগের চেয়ে বুদ্ধিগত বিচার বিশ্লেষণই বেশী প্রাধান্য পাওয়ায় অধিকাংশক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে শুধু অনুকম্পাই প্রকাশ পেয়েছে। একাত্ম হওয়ার আগ্রহ কম। একথা সত্য যে, লোকসঙ্গীত পল্লীজীবনের ঐতিহ্যানুসারী হওয়ায় নাগরিক জীবনের সাথে পরিচিত সম্প্রদায়ের পক্ষে এই সঙ্গীতের রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে মূলগত বাধা আছে। পল্লীজীবনের বহুধা বিস্তৃত উপকরণের সবই সাঙ্গীকরণ করে নিয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখে এই লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীত-শিল্পীর কোন গুরুর দরজায় বেগার খাটার দরকার হয় না। এ সঙ্গীত দরবারের নয়। লোকের। সকলের। তাই গুরু শিষ্যের শিক্ষিত বিভাগের স্থান নেই এ সঙ্গীতের আঙ্গিনায়। এখানে সকলের গান

গাওয়ার সমান অধিকার। এ গান শেখার জন্যে কোন কেতাবী রীতি নেই। কণ্ঠস্বর মিষ্টি না হওয়ার জন্য, কিংবা সুর বা তালজ্ঞান না থাকার জন্য, কারুর লজ্জা ভয় বা মাথাব্যথা নেই। যে কোনআসরে মিলিত কণ্ঠের সুরের যে ঐকতান লোকসঙ্গীতের তা-ই সম্পদ। শ্রোতার ইচ্ছা অনুযায়ী, তৃপ্তি অনুযায়ী, পরিবেশনের ভঙ্গীও পরিবর্তিত হয় এ সঙ্গীতে।

লোকসঙ্গীতে বাদ্যযন্ত্রের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। কোনদিনই বাদ্যযন্ত্রকে লোক-সঙ্গীতের অপরিহার্য্য অঙ্গ ব'লে মনে হয় নি। অতীতে লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে মহড়ার প্রচলন ছিল না বললেই চলে। কিন্তু বর্তমানে অনুষ্ঠান বা উৎসব উপলক্ষ্যে স্বগ্রামে বা ভিন্নগ্রামের ভিন্নগোষ্ঠীর সাথে অনেক সময় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হচ্ছে। তাই মহড়ার প্রচলন দেখা দিয়েছে। আর্থিক অসংগতি উপেক্ষা করে উৎসবের আনন্দকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রলোভন এর অন্যতম কারণ।

লোকসঙ্গীতের শ্রেণীবিভাগ

লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বিচার করে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য লোকসঙ্গীতকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন :

১। **আঞ্চলিক**—এই জাতীয় লোকসঙ্গীত বিশেষ কোন অঞ্চলের মাঝেই সীমাবদ্ধ। যেমন পটুয়া, ভাদু, টুসু (পশ্চিমবঙ্গ); গম্ভীরা, জাগ, ভাওয়াইয়া (উত্তরবঙ্গ); জারি, সারি (পূর্ববঙ্গ)।

২। **পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীত**—Functional বা মেয়েলী সঙ্গীত। সব মেয়েলী সঙ্গীত ব্যবহারিক সঙ্গীত নয়। পরিবারের সীমানার মধ্যেই এই গান গীত হয়। পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির সাথে এর নিগূঢ় সম্পর্ক। পরিবারের বাইরের যে বৃহত্তর জীবন তার সাথে এর সম্পর্ক নেই। বিবাহ, সাধভক্ষণ, জাতকর্ম, অন্নপ্রাসন ইত্যাদি উপলক্ষ্যে মেয়েরা যে গান গায় তা-ই পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীত। আচার অনুষ্ঠানের সাথে এই গান গীত হয়। এ গানে ভাবের কোন গভীরতা নেই।

৩। **আনুষ্ঠানিক বা পার্বণ সঙ্গীত**—প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দিবসে কোন পূজাপার্বণ উপলক্ষ্যে যে লোকসঙ্গীত গীত হয় সেগুলিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। এ জাতীয় সঙ্গীত মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পুরুষ ও বালক বালিকাদেরও অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায় এ গানে।

৪। **কৃষি সঙ্গীত**—Work song কর্মবিষয়ক লোকসঙ্গীত।

উত্তর-রাঢ়ে বিবাহ ব্যতীত পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীতের প্রচলন নেই বললেই চলে। কৃষিবিষয়ক সঙ্গীতের প্রচলনও খুব কম।

এই জনপদের লোকসঙ্গীতের ধারা বিশ্লেষণ করলে লোকসঙ্গীতকে উপরিউক্ত বিভাগ ছাড়া আরও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(ক) জীবিকাশ্রয়ী—জীবিকা অর্জনের জন্য বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী লোকসঙ্গীতের আশ্রয় গ্রহণ করে। জীবিকা অর্জনের জন্য গায়কের যে ক্লান্তি, যে বেদনা, তা এ শ্রেণীর গানে রুক্ষতা এনে দেয়, যদিও শ্রোতার রস গ্রহণে তাতে কোন অসুবিধা হয় না। এ গান উত্তরাধিকারসূত্রে অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করে। গানের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিই গায়ককে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়। গায়কের ব্যষ্টি চেতনা শ্রোতৃমণ্ডলীর সমষ্টি চেতনার সাথে যুক্ত হ'য়ে জীবিকার স্থূল বাস্তবতাকে বিস্মৃত ক'রে উভয়ের মাঝে একটি রসঘন ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি করে। যেমন পটুয়া, বেদের গান, ছাদ পেটানোর গান। অনেকে এ ধরনের গানকে Professional song-এর পর্য্যায়ভুক্ত করেছেন। এ গান একটি সম্পূর্ণ জাতি বা গোষ্ঠিকে এই অসম অর্থনীতির চাপের মাঝেও অস্তিত্বরক্ষার অনুপ্রেরণা দিচ্ছে, নতুনতর শক্তির সঞ্চার করছে।

(খ) পূজাশ্রয়ী—বিশেষ কোন দেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে যৌথভাবে যে গান গাওয়া হয়—যেমন গাজন, বোলান, ভাঁজো, ভাদু। এগুলো 'পার্বণ সঙ্গীতের'ও পর্য্যায়ভুক্ত। দেবদেবীর পূজাকে অবলম্বন করে যেহেতু এই গীত, সেহেতু এক্ষেত্রে ধর্মীয় চেতনা পুরোপুরিভাবেই দেখা যায়। লোক-সঙ্গীতের দেবদেবী অন্ত্যজ পরিবারের আপনজন। এই দেবদেবীকে কেন্দ্র করেই বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ের অপত্য স্নেহ, দয়িতের প্রেমসুধা, সঙ্গীর অন্তরের প্রীতি, সবই ভাষায় ও ভাবে ব্যক্ত হয় লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে। সংসারের যত অতৃপ্ত কামনা বাসনা পরিতৃপ্ত হয় দেবদেবীর লীলাখেলায়।

(গ) পরিবারাশ্রয়ী—পারিবারিক কোন উৎসব বা সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে যে গান গাওয়া হয় সেগুলিকে এই পর্য্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। যেমন বিয়ের গান, ঝুমুর গান ইত্যাদি।

(ঘ) বিবিধ—লোকসঙ্গীতের যে সমস্ত শাখাকে উপর্যুক্ত পর্য্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না তাদেরকেই বিবিধ শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

লোকসঙ্গীতের মূলগত যে ভাব—যে ধর্মীয় চেতনার দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব

উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীতের সাথে বাঙলার অন্যান্য প্রান্তের লোকসঙ্গীতের ঐক্য রচনা করেছে—সেই ধর্মীয় চেতনাই উত্তর-রাঢ়ের উপর্যুক্ত শ্রেণীবিভক্ত লোক-সঙ্গীতের মাঝে এক ভাব সংহতি রচনা করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রামায়ণের কাহিনী ও রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম পর্বে আমরা উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীতের গতি প্রকৃতি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় পর্বে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর লোকসঙ্গীত সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করবো। আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে পটুয়াসঙ্গীত নিয়ে।

পশ্চিম বাঙলার পশ্চিম সীমান্তে বিশেষ করে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় 'পটুয়া' বা 'পোটো' নামে এক সম্প্রদায়ের বাস আছে যারা বর্তমানে বিলুপ্ত হতে চলেছে। চিত্রাঙ্কন এদের প্রধান উপজীবিকা। পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কাহিনী চিত্রাঙ্কন এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে চিত্র বর্ণনা করে ওরা জীবিকা অর্জন করে। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' ওদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষসে' মহামতি গুপ্তচর যে 'জম পট্টিক'-এর উল্লেখ করেছে এই জনপদে তারাই 'পটুয়া', 'পেটে' বা 'পোটো' নামে পরিচিত। প্রধানতঃ যমরাজার পট দেখিয়ে এরা গান গায়—

পণ মহ জমস্স চলনে
কিং কজ্জং দে অ এহিং অন্নিহিং
এসো খু মারেই অন্ন ভত্তানাং চডপডন্তং

যমের চরণে পেন্নাম করো, অন্য দ্যাবতায় কি কাজ? অন্য দ্যাবতার ভক্তদের ইনি মারেন। তারা ছটফট করে (চড়বড় করে)।

পরবর্তীকালে ওরা রামলীলা ও কৃষ্ণলীলার পট ও আরও পরবর্তীকালে (শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর) চৈতন্য লীলার পটও এঁকেছে। কিন্তু সেসব

পটে সবশেষে যমরাজা ও যমালয়ের ভয়াবহ চিত্র থাকে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হতে একই ধারা আজও প্রবাহমান।

পট বলতে সাধারণত আমরা হস্তাঙ্কিত চিত্রকেই বুঝি। ব্যাপকার্থে পটের এই প্রয়োগ ঘটলেও প্রকৃতপক্ষে পট বলতে বিশেষ এক ধরণের চিত্রকেই বোঝায়। বর্তমানে কাগজে বা মৃত্তিকায় পটশিল্পের প্রচলন ঘটলেও মূলতঃ কাপড়ের উপর অঙ্কিত চিত্রকেই পটচিত্র বলা হয়। সংস্কৃত বা পালিতে 'পট' শব্দের অর্থ কাপড়। কেহ কেহ মনে করেন যে পট শব্দের উৎপত্তি এই 'পট্ট' শব্দ হতে। বৈদিক ভাষায়ও পট শব্দের অর্থ কাপড়। মহাভারতেও চিত্র অর্থে পট শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পটের চিত্র সম্পর্কিত আলোচনা বৌদ্ধগ্রন্থ 'আর্য্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প'-এ পাওয়া যায়। চীনা বা তিব্বতী কাপড়ের উপর এই পটচিত্রের প্রচলন ছিল। পট মানে আবার ছবিও। এ সম্পর্কে অধ্যাপক সুনীল চক্রবর্তী তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ "লোকায়ত বাংলায়" বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি পট্ট থেকে পটের উৎপত্তি—এই যুক্তিই মানেন নি।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থের প্রথম ভাগে পটচিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন 'আমরা বুদ্ধের সময় হইতে একদল লোকের সাক্ষাৎ পাই যাহাদের ব্যবসা ছিল ছবি দেখাইয়া লোকের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করা। ইহাদিগের উপাধি ছিল 'মস্করী'। দণ্ডের সহিত সংযুক্ত চিত্রাঙ্কিত কোন বস্ত্র অথবা 'ধ্বজ—দণ্ড' অর্থে কবিকঙ্কণ 'মস্করী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন'।

'পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণাঞ্চ কোপতঃ,'—ব্রহ্মার শাপে, ব্রাহ্মণের কোপে ওরা সমাজে পতিত হয়। একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে ওরা ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণকে নিজেদের আচারে তুষ্ট করতে পারে নি। আর্য্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যখন কার্য্যকরী হয়নি তখনই এই আর্য্যেতর সম্প্রদায়কে অভিশাপ বরণ করে নিতে হ'য়েছে। চিত্রাঙ্কণের ক্ষেত্রে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় পৌরাণিক রীতির পরিবর্তে লৌকিক রীতি অনুসরণ করাই বোধহয় আর্যসম্প্রদায়ের ক্রোধের মূল কারণ। এই অন্-আর্য্যসুলভ স্বতন্ত্র স্বাধীন মনোবৃত্তির জন্যই সমাজের উচ্চবর্ণের অভিশাপ কুড়িয়ে ওরা পতিত হয়েছে। আর্য্য সম্প্রদায়ের ঘৃণার ফলে এরা অন্য ধর্ম বরণ করে; এবং পূর্ব অভ্যাসমত হিন্দুদের আচারাদিও মেনে চলে। সেই সমাজেও এদের স্থান নেই। নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সীমাবদ্ধ। মেয়েরা শাঁখাসিন্দুর পরে, হিন্দুর দেব-দেবীর চিত্রাঙ্কন করে, সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে, সঙ্গে সঙ্গে অবলম্বিত ধর্মানুষ্ঠানও প্রতিপালন করে।

পট আঁকাই এদের প্রধান বৃত্তি। গ্রামের লোকে এই পট কিনে পূজা করতো। পরবর্তীকালে লোকে ছবি কিনে পূজা সুরু করলো। তখন মালাকার সম্প্রদায়ও পট আঁকা সুরু করে দেয়। গ্রামের মেলা খেলায় পট ও পুতুল বিক্রি হতে লাগলো। কোন কোন গ্রামে পটুয়ারা সাপুড়ের বৃত্তিও গ্রহণ করেছে। যখন পট এঁকে বা গান গেয়ে অথবা সাপুরে বৃত্তি নিয়েও জীবিকা অর্জ্জন করা গেল না, তখন ওরা ছাদ মিস্ত্রির কাজ, ছুতোরের কাজ ও দেওয়াল রং করার কাজ গ্রহণ করলো।

পট দুই শ্রেণীর হয়ে থাকে। এক শ্রেণীব নাম চৌকা পট, যাতে এক একটি চিত্র বিচ্ছিন্নভাবে অঙ্কিত হয়, ও সেখানে গান সহযোগে তা ব্যখ্যা করার রীতি নেই। অন্য পটের নাম দীঘল পট বা জড়ানো পট। এতদঞ্চলে দীঘল পটের প্রচলন বেশী। কোন একটি উপাখ্যানের প্রধান প্রধান অংশগুলো পটের উপর হ'তে নীচ পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড ভাবে চিত্রিত থাকে। গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে পটুয়া এই পট ক্রমে ক্রমে খোলে ও গীতি সহযোগে খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলোর ব্যাখ্যা করে। গীতি ও চিত্র উভয়ের সংযোগে একটি অখণ্ড ভাবব্যঞ্জনাময় আখ্যায়িকার সৃষ্টি হয়।

মূলতঃ পৌরাণিক দেব দেবীরাই পটের বিষয়বস্তু হলেও গীতি সহযোগে বর্ণনার সময় দেবদেবীর লৌকিকরূপই প্রাধান্য পায়। এটি অনার্য্য মানসিকতার উত্তরাধিকার। দীঘল পটের প্রথম চিত্রের বর্ণনার পর সুরু হয় দ্বিতীয় ও তারপর অন্যান্য চিত্রের বর্ণনা। কী ধরণেব গান গীত হয় তার কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে। ধরুন জটায়ু পক্ষীর গলায় রাজা দশরথ নিজের গলার মালা পরিয়ে দিচ্ছেন। তখন গান চলে—

কোথায় ছিল জটায়ু পক্ষী রথ ধরে নামছিল
জটায়ুর সাথে রাজা তবে মিত্রতা পাতাইল
আমি বনের পাখী বনজন্তু রাজা মিত্রতার কি জানি
অন্তিমকালে দিও তোমার রাঙা চরণ দুখানি
নিজের গলার মালা খুলে রাজা (আজ) জটার গলায় দিল
জটার সাথে জনম জনম রাজা মিত্রতা পাতাইল।
এইখানে থাকো জটা মিত্র পাখী রথখানি আগুলে
আমি চলিলাম গহন কাননে মৃগ শিকার করিগে।

এবার দ্বিতীয় ছবি জড়িয়ে নেয়। তৃতীয় ছবি বের করে। সেখানে আছে সিন্ধুর পিতামাতা সিন্ধুকে জল আনতে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন—

ব্রত একাদশী করে আছেন বনের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দুজন
কাল গেছে একাদশী ব্রত ব্রাহ্মণের পালন
'পারনের জল আনো গুণের সিন্ধু' করি নিবেদন
'নিত্য যাই নিত্য আসি পিতা সরবরের ঘাটে
আজকে আর যাবো না পিতা প্রাণ কেন কেঁদে উঠে
ধর্ম্ম করে মরে যদি পাণ্ডবের নন্দন
তবে ধর্ম করে কেন তারা কিসেরি কারণ'
কাঁদিতে কাঁদিতে সিন্ধু কুণ্ড নিল হাতে
যায় সরোবরের ঘাটে।'

স্মরণীয় যে, পটুয়াগণ যে চিত্র অঙ্কন করে—তা তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত বেহুলা লখীন্দর ও মনসা বিষয়ক, দ্বিতীয়ত রামায়ণ বিষয়ক, তৃতীয়ত ভাগবত বিষয়ক। লক্ষ্যণীয় এই যে পটুয়া সম্প্রদায় মহাভারতের বিষয়ে চিত্রাঙ্কন করে না। সাপুরে বা বেদে যেমন সাপ খেলার সময় মনসার গান করে, পটুয়া সঙ্গীতেও তেমনি মনসা মাহাত্ম্য প্রাধান্যলাভ করে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, পটুয়া ও সাপুরে সম্প্রদায়ের মধ্যে অতীতে কোন যোগাযোগ ছিল; হয়তো বা উভয়ে একই সম্প্রদায়ের দুই শাখা। স্থানীয় বা লৌকিক কাহিনী নিয়েও অনেক সময় পট অঙ্কিত হয়। মুসলমান ধর্মপ্রচারের জন্য ওরা গাজীর পটও অঙ্কন করে।

বর্তমানে উত্তর-রাঢ় অঞ্চলে যে পটুয়া সম্প্রদায় আছে—তারা নিমাই সন্ন্যাস, রাধাকৃষ্ণ, পার্বতীর শাঁখা পড়া, সিন্ধুবধ, গোমঙ্গল, মহাদেবের চাষ করা, পঞ্চকল্যাণী, দশাবতার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পট অঙ্কন করে।

সিন্ধুবধের যে দীঘল পট তাতে সর্বপ্রথম যে চিত্র দেখা যায় তাতে আছে রাজা দশরথ রাজসভায় পাত্রমিত্র পারিষদ নিয়ে বসে আছেন। প্রজাগণ এসেছেন অভিযোগ জানাতে। শুধু এইটুকু খুলে গীত শুরু হয়—

আজ অজ রাজার পুত্র রাজা[১] নাম দশরথ
শোভা করে বসলো রাজা (আজ) লয়ে প্রজাগণ।
(আজ) রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজায় কষ্ট পায়।
গিন্নির পাপে গৃহস্থ নষ্ট
ঘরের লক্ষ্মী উড়ে যায়।
নিপুত্র বলে রাজাকে অযোধ্যার লোকে।
নিপুত্র রাজার আমরা মুখ না হেরিব

নারদ মুনি কহেন কথা 'শুনুন মহাশয়'
শনিকে যদি বধিতে পারো তাহলে রথ শয্যা হয়।
জিন্ বন্দী করে রাজা ঘোড়া সাজাইল
শনির উপরে বাণ রাজা তবে নিক্ষেপ করিল
এক বাণ রাজা মারে
রাজা দুই বাণ মারে
রাজা দুই বাণ মারে
তিন বেলায় শনি নিঃশ্বাস ছাড়িল
শনির নিঃশ্বাসে রথ রথী সারথি ঘোড়া
নিল ঘোড়া খাসা জোড়া বিনন্দের পাগড়ী।
রথ রথী, সারথি ঘোড়া সব উড়িতে লাগিল।
কাঁদিতে কাঁদিতে সিন্ধু জল ভরিতে লাগিল।
জলের ডুকডুকি শব্দ রাজার কর্ণগত হ'ল
বনে মৃগ শিকার ব'লে সিন্ধু বধিল।
কে মারিলি আমায় শব্দভেদী বাণ
শীগগির করি লয়ে চল অঙ্গ গেল জলে
আমার অন্ধ মাতাপিতার কাছে।
অন্ধ মাতাপিতা কাঁদছে আমার বনের ভিতরে
ঘোড়ার পৃষ্ঠ থেকে নেমে রাজা
মরা সিন্ধুকে নিল কোলে
হায় কি করিলাম কোথায় গেলাম
কার বা নন্দন পেলাম
গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা-সুরাপান যে জন করে
চার পাপের পাপী তারা
তাদের পাপের পরিত্রাণ নাই।

পট পরিবর্তিত হয়। নতুন পটের আবির্ভাব ঘটে। মৃত সিন্ধুকে কোলে করে রাজা দশরথ ঋষিগৃহে উপস্থিত। অন্ধ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী শোকে মুহ্যমান হ'য়ে অভিশাপ দিচ্ছেন।

১। ইটাগড়িয়ার কাসেম চিত্রকরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আজ মরা সিন্ধু কোলে রাজা যায় মুনির দ্বারে
ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে রাজা মুনির দ্বারে এল।
পাতার মড়মড়ি শব্দ মুনির কর্ণে এল
'কে এলি রে বাপ সিন্ধু এলি বল্ না বচন
মা বলে ডাক রে বাছা জুড়াক দুখিনীর জীবন'।
'একা সিন্ধু নয়—মুনিমাতা রাজা দশরথ
না বুঝিয়া বধেছি মুনি তোমার নন্দন।'
'কি বলিলি-আঁটকুড়ো রাজা কি বেরুলো তোর মুখে'
আকাশ পাতাল ভেঙ্গে পড়লো অন্ধ মুনির বুকে।
মৎস্য চেনে নদী গম্ভীর পক্ষী চেনে ডাল
মায়ে বসে কাঁন্দে পুত্রহারা যার।
'তোর পুত্র যদি আছে-রাজা নিপুত্র হইবি
পুত্র যদি নাহি রাজা চাবি পুত্র পাবি।
পুত্রের বেদন জানবি রাজা যেদিন রামকে দিবি বন।'

ধীরে ধীরে হয় পটের পরিবর্তন। গান এগিয়ে চলে—

একজনের মরণ দেখে (রাজা) তিনজনেই মরিল।
তিনজনের সৎকার্য রাজা একই চিতায় করিল।
নিমকাষ্ঠ চন্দন কাষ্ঠ দিয়ে চিতা সাজাইল
কলসী কলসী ঘৃত মধু ঢালিতে লাগিল
দাহন করে রাজা ব্রাহ্মণকে করে দান
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে মুনির গেল প্রাণ।

ইতিমধ্যে নতুন চিত্রের উদয় হয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি রাজা দশরথকে যজ্ঞশেষে চরু প্রদান করছেন। রাজা পরম ভক্তিভরে তা গ্রহণ করছেন—

বাপ যার বিভাণ্ড মুনি মাতা তার হরিণী
হরিণী গর্ভে জন্ম নিল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি নামে যজ্ঞ আরম্ভিল
যজ্ঞ না পূর্ণ হ'তে চরু উঠিল
এই নাও, চরু নাও, রাজা দশরথ তোমার নন্দন
এই চরু দান করে (রাজা) জন্ম নেবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

গান গাইতে গাইতে পটিকার শেষ চিত্রে উপস্থিত হ'য়েছে। রাজা দশরথ সেই

চরু রাজমহিষীদের প্রদান করছেন—সন্তান কামনায় উজ্জ্বল রাজমহিষীরা তা' গ্রহণ করছেন পরম পুলকভরে—

চরু নিয়ে গিয়ে রাজা কৌশল্যার হাতে দিল
সেই চরু কৈকেয়ী, কৌশল্যা, সৌমিত্রি পান করি নিল
সেইদিন হইতে রাম জন্ম নিল।

এই গান এককভাবে গাওয়া হয়। এ গানে কোন বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন নেই।

মাত্র সাতটি চিত্রের মাধ্যমে সিন্ধুবধ উপাখ্যানটি বিবৃত করা হয়েছে। একটি চিত্রের সঙ্গে পরবর্তী চিত্রের ঘটনার যে ব্যবধান তা পটুয়া অপূর্ব দক্ষতার সাথে সঙ্গীতের মাধ্যমে পূরণ করে দেয়। দরদী শ্রোতার মনে এই ব্যবধান বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে না।

লক্ষণীয় এই যে, এই সঙ্গীতের মাধ্যমে লোকশিক্ষা প্রচারের চেষ্টা হয়েছে। পৌরাণিক উপাখ্যানাশ্রিত এই শিক্ষা কৌমসমাজে ও সমাজের অন্দরমহলে সহজেই সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। যথা—

গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট
ঘরের লক্ষ্মী উড়ে যায়।

নিছক লোকশিক্ষা ব্যতীত এই অপ্রাসঙ্গিক ছত্রের সংযোজন মূল্যহীন। পরবর্তী ছত্রে রাষ্ট্রশাসকের সাথে প্রজার সম্পর্ক পরিস্ফুট।

পৌরাণিক পাত্রপাত্রীকে লৌকিক রূপ দেওয়ার জন্যই অন্ধমুনির মুখে অন্-আর্য্য রীতিসম্মত গালি শোনা যায়—'আঁটকুড়ো রাজা'—অথচ সঙ্গীতে অনেকক্ষেত্রে সাধুভাষার প্রয়োগ দেখা যায়।

পুরুষানুক্রমে এই গান চলে আসছে। ফলে গানের কোন কোন অংশ ব্যাখ্যায় পটুয়া নিজেও অসমর্থ। 'বিনন্দের পাগ্ড়ি', 'চৌলসি বন'-এগুলির অর্থ অপরিস্ফুট। হয়ত বা এগুলি কোন মূল শব্দের অপভ্রংশ। অবশ্য এর জন্য সঙ্গীতের রসসৃষ্টি ব্যাহত হয় না।

সঙ্গীতটি শুনলেই বোঝা যায় যে এর রচনার ক্ষেত্রে কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি মেনে চলা হয়নি। গায়কের সুবিধামত মাত্রা প্রয়োগ করা হ'য়েছে। কিন্তু গান গাওয়ার সময় পটুয়া একজন নিপুণ গায়কের মত টেনে টেনে মাত্রার ব্যবধান পূরণ করে নেয়। ফলে শ্রোতার কাছে একটি অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীতধারা পরিবেশিত হয়। সঙ্গীত রচনার পদ্ধতি, ভাব, ভাষা ও সুর দেখলে বা শুনলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে এ সঙ্গীত রচনার জন্য বিশেষ কোন প্রতিভাসম্পন্ন গীতিকার বা সুরকারের

অবদান নেই। অত্যন্ত সহজ; সরল ও স্বাভাবিক রীতি অনুসারে সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় এই সঙ্গীতের উদ্ভব।

এই সঙ্গীতের মধ্যে যে বাৎসল্যরস, ভক্তিরস, করুণরস দেখা দিয়েছে তার বিশেষ একটি মানবিক আবেদন আছে। পটুয়া যখন অন্তরের সমস্ত বেদনা দিয়ে, কণ্ঠে সমস্ত দরদ দিয়ে, ভাব গদগদ চিত্তে গান ধরে—

আকাশ পাতাল ভেঙে পড়লো
অন্ধ মুনির বুকে,
কিংবা 'মায়ে বসে কাঁদে
পুত্রহারা যার'।

তখন এক দুর্নিবার শোকে শ্রোতৃমণ্ডলীর চোখ ছলছল করে ওঠে। চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু অশ্রু দেখা দেয়। অপত্য স্নেহের যে সার্বজনীন আবেদন—বেদনাবোধের যে সার্বজনীন রূপ—তা আর ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। পটুয়ার বর্ণনপটুত্বে প্রবহমানকালের সোপান বেয়ে শ্রোতৃহৃদয়ের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়।

অধিকাংশ পটের শেষে লোকশিক্ষা প্রচারের জন্যই যমপুরীর এক বিভীষিকাময় চিত্র উপস্থাপিত করা হয়। অপরাধপ্রবণ মানুষের মন এই বিভীষিকাময় চিত্র দেখে পাপকার্য্য হতে বিরত হয়। দেবতার উপর ভয়জনিত ভক্তিভাবেরও উদয় হয়। ভক্তিভাবের এই তামসিকতা, শাস্তিদানের এই বীভৎসতা দেখেই কৌমজীবনের সাথে এদের যোগাযোগ অনুমান করা যায়। আজও সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। পটুয়া সঙ্গীতে ভণিতার প্রয়োগও দেখা যায়। সাধারণত ভণিতায় ঈশ্বর-স্তুতি বা বন্দনাগীতি গীত হয়। যেমন 'নিমাই সন্ন্যাস' সঙ্গীতের সুরু হয়—

'আজি জয় নিত্যানন্দ প্রভু
জয় নিত্যানন্দ
আজ অদ্বৈতচাঁদ ভক্ত গৌর ভক্তবৃন্দ।

অথবা 'গোমঙ্গল' সঙ্গীতের সুরু হয়—

নমো দুর্গা নমো নারায়ণী[২]
কৃপা করো দয়া করো বিপদতারিণী

২। বাগডোলা গ্রামের কোরবান চিত্রকরের সৌজন্যে প্রাপ্ত

বিপদে পড়িয়া মাগো করি যে স্মরণ
তুমি গো মাতা ভগবতী—আদ্যাশক্তি জগতের জননী
কৃপা করি দয়া করি দিও মা তোমার চরণ দুখানি।'

পটুয়া সঙ্গীত মূলত উপাখ্যানাশ্রয়ী তাই বর্ণনাত্মক –ভাবাত্মক নয়। না হিন্দু না মুসলমান—এই মিশ্র সংস্কৃতির অভিশাপ পটুয়া সম্প্রদায়কে অনিবার্য কারণে বরণ করে নিতে হয়েছে। চিত্রশিল্প ও সঙ্গীত দুই সূক্ষ্ম রসের কারবারী হয়েও অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও উচ্চ বর্ণের অবজ্ঞা আর অবহেলায় এদেশ পেশাগত কৌলীন্যকে পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করে নিতে হয়েছে।

বেদের গান

অনার্য্য বংশোদ্ভূত এই বেদে বা সাপুড়ে সম্প্রদায় বিষাক্ত সাপ ধরে ও সঙ্গীত সহযোগে গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে এই সাপের খেলা দেখিয়ে জীবিকা অর্জন করে। এখনও গ্রামাঞ্চলে এই রীতি প্রচলিত যে সাপুড়ে শ্রীদুর্গা পূজার পর একাদশীর দিন তার সাপের ঝুড়ি নিয়ে প্রতি বাড়ী যাবে ও গান করে সাপের খেলা দেখাবে। যখন দ্রুত তালে ডুগডুগি (ডমরু) বাজে তখন সাপুড়ে ঊর্ধাঙ্গ দুলতে থাকে—সাথে সাথে দোলে ছোটবড় বিষাক্ত সাপ। এক হাতে ডুগডুগি অন্য হাতে মুঠো বাঁধা। কখনও বা হাঁটু এগিয়ে, কখনও বা মুঠো ঘুরিয়ে, সাপুড়ে বিচিত্র সুর ও তালের সৃষ্টি করে। গান খুব টেনে টেনে গায়। কখনও বা মুঠো এগিয়ে দিয়ে বা ডুগডুগির খোঁচা দিয়ে সাপকে উত্তেজিত করে দেয়। ক্রুদ্ধ সাপ ব্যর্থ ছোবল মারে।

এই বেদে সম্প্রদায় সম্পর্কে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', পুস্তকে লিখেছেন—'অন্ত্যজ বর্ণের যাযাবর ডোম-শবর-পুলিন্দ-নিষাদ-বেদে প্রভৃতিদেরই অন্যতম বৃত্তি ছিল সাপ খেলা, যাদুবিদ্যার নানা খেলা দেখানো ইত্যাদি। সাপের উপদ্রব ছিলই। মনসা পূজাই তার অন্যতম সাক্ষ্য। রাজসভায় জাঙ্গলিক বা বিষ বৈদ্য অন্যতম রাজপুরুষ ছিলেন। জাঙ্গুলী সাপেরই অন্য নাম। সাপের কামড়ে অনেককেই প্রাণ দিতে হত। সেইজন্য ওঝা বা বিষ বৈদ্যদের সমাজে একটি স্থান ছিল। ওরাই ছিলেন সাপুড়ে। উমাপতি ধরের একটি শ্লোকে সাপ খেলার বর্ণনা আছে। গোবর্দ্ধন আচার্য্যের একটি শ্লোকেও সাপ নাচানোর বর্ণনা পাওয়া যায়—'হে সখি, সাপ খেলা দেখিতে দেখিতে তোমার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া মধুরতর দেখাইতেছে। অতএব, কেন

তুমি পরের জীবনকে বিপদাপন্ন করিতেছ? তুমি দূরে সরিয়া যাও, সাপুড়ে প্রাঙ্গণে নির্বিঘ্নে সাপখেলা দেখাক।'

উমাপতি ধর ও গোবর্ধন আচার্য্য লক্ষণ সেনের রাজ সভার কবি ছিলেন। দ্বাদশ শতকের এই শ্লোকই ওদের ঐতিহ্যের কথা প্রমাণ করে।

সাপ মনসা দেবীর বাহন। মনসা পূজা মূলতঃ অনার্য্য সম্প্রদায়ের। পূজা-পদ্ধতি ও উপাচার অবৈদিক। পরবর্তী আর্য্য সম্প্রদায় ভয়ে এই দেবীকে মেনে নিয়েছে। সাপুড়ের যে গান তাতে মুখ্যত মনসাদেবীর স্তুতি ও মাহাত্ম্য বর্ণনা, বেহুলা-লক্ষিন্দরের কাহিনীই থাকে। তবে সাপুড়েরা তাদের গানকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। ১। মনসাসার, ২। ফুলসার ৩। কৃষ্ণসার ও ৪। রামসার। প্রত্যেক শ্রেণীর গানের দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হ'ল—

১। মনসার: মা মনসার চরণ[৩]

মা মনসার চরণ
বারানখানা ধূলাতে লুটায়।

২। ফুলসার: মায়ের ফুল তুলিতে যাব গো

ডুবুরারই ফুল নিয়ে মায়ের কাছে দোব গো
শ্বেত আকন্দের ফুল মায়ের কাছে দোব
কত শত ফুল আজ মায়ের কাছে দোব
মুর্শিদ রাখে হে জীবন
কার বা সাঁঝ বহি যায়
সাত বোন তারা তখন প্রণাম জানায়।
লালজবার ফুল মায়ের কাছে দোব
শ্বেতকুঁচের ফুল মায়ের কাছে দোব
শ্বেতকরবীর ফুল মায়ের কাছে দোব
শ্বেতপদ্মের ফুল মায়ের কাছে দোব
ও গো মায়ের ফুল তুলিতে যাব।

৩। কৃষ্ণসার: বিষ ওড়ে কিসে

বেউনী[৪] বাতাসে বিষ ওড়ে
'হরিবল' ব'লে বিষ উড়িতে লাগিল

৩। ফরিদপুর গ্রামের ভক্তিভূষণ দাসের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৪। পাখা।

হে হরি—কি হ'ল ?
যা চাইতে বিষ ম'ল।
৪। রামসার: গুরু ভক্তিতে প্রাণ যায়
বিফলে মানুষ জীবন
আর কি হ'বে ভাই।
বল মুখে রাম রাম
বিষের নাম লীলা
যেখানে খেলি সাপা
সেখানে বিষ ম'ল
—কার দ'য়[৫]
আস্তিক মুনির দয়া।
রামগুণ গাও কি
কৃষ্ণগুণ গাও
হে নারদ মুনি
বদনে রামগুণ গাও।

বেহুলা লক্ষ্মীন্দর উপাখ্যানও গানের মাঝে প্রায়ই শোনা যায়—

'মা বাঁচাও—মা বাঁচাও' বলে
কাঁদিছে বেহুলা গো।
চম্পক নগরী ছিলো লোহার বাসর ঘরে গো।
'মা বাঁচাও·········বেহুলা গো।
বেহুলা কাঁদে পতি শোকে পড়ে ধূলিতে গো।
'মা বাঁচাও·········বেহুলা গো।
বিষে অঙ্গ জরজর সোনার লখিন্দর গো
লখিন্দরকে সঙ্গে নিয়ে ভাসে গঙ্গার জলে গো
মা ··· ··· ··· ··· বেহুলা গো।
চম্পক নগর রাজ চাঁদ নামে সদাগর
বেহুলা তার পুত্রবধূ স্বামী বালা লখিন্দর গো।
ছয় পুত্রে দংশিলে বালার ছয় বৌ করলে রাঁঢ়ী গো

৫। দয়া।

'মা বাঁচাও ... ... গো।[৬]

উপর্যুক্ত গান দেখে সহজেই বোঝা যায় এই গানে ধুয়ার প্রচলন আছে। এই গান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একক, তবে কখন কখন যৌথভাবেও গীত হয়।

ছাদ পেটানোর গান

এই জাতীয় সঙ্গীতকে ঠিক লোকসঙ্গীতের পর্য্যায়ে ফেলা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। যে কর্ম জীবিকাকে কেন্দ্র করে এই গান—সেই কর্মের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের নয়। এ গানে পল্লীজীবনের ভাবালুতার স্পর্শ নেই। কিন্তু যারা এই গান করে তারা এককালে কোমবদ্ধ জীবনধারায় অভ্যস্ত ছিল। আজও এদের সামাজিক জীবনে আর্য্যেতর সভ্যতার আদিম রূপটি সুস্পষ্ট। শহরাঞ্চলে নতুন বাড়ী তৈরী হলে ছাদ পেটানোর সময় এদের ডাক পড়ে। সাধারণত বাউরী, বাগ্দী শ্রেণীর মেয়েরাই এসে সমবেত হয় এ কাজের জন্য, যারা কাজের গতি ও তালের সাথে সাথে দুলে দুলে বিচিত্র সুরে যৌথভাবে গান গায়; কাউকে শোনাবায় উদ্দেশ্যে নয়; কিছুটা নিজেদের খুশীর আমেজে; কিছুটা কর্মক্লান্তি অপনোদনের জন্য বা নতুন উদ্যম সঞ্চারের জন্য। গাইতে গাইতে মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে আদি রসিকতায় হেসে গড়িয়ে পড়ে। গান থামে না, কাজ শেষ হয়। গানও থামে। গান ছাড়া এ ধরণের কাজের কথা চিন্তা করা যায় না। কাজ যারা করে তাদের মাঝে সবচেয়ে বর্ষীয়সী মহিলা প্রথমে গান ধরেন—

কনের মাকে বাইরে শুতে মানা
ওগো ধুমধুমা নাকড়া এসে করে আনাগোনা।
কনের মাকে ... ...

সকল কর্মী যোগ দেয় এই গানে। কিছুক্ষণ পরে আবার নতুন গান সুরু হয়—

উপর ছাদে দে বাড়ি[৭]।
ছাদ ব'সে না রূপায়[৮] কি করি॥

৬। রুদ্রনগর গ্রামের •ভুলু খলিফার (বেদে) নিকট সংগৃহীত
৭। আঘাত
৮। উপায়

গানের সাথে কাজের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বলেই এই গানকে Work song, কর্ম সঙ্গীত অথবা জীবিকাশ্রয়ী সঙ্গীত বলা যেতে পারে।

ভাঁজো

'ভাঁজো লো কলকলানী মাটির লো সরা'—বিচিত্র সুরে একসাথে নানান বয়সের মেয়েরা গেয়ে উঠে। সাথে সাথে নেচে চলে কিশোরীর দল অপরূপ দেহ-ব্যঞ্জনায়। মনে তাদের খুসীর আমেজ—তাই এই নাচগান আর রঙ্গরস। আর আছে বিশ্বাসের দৃঢ়তা। জানে এভাবেই ভাঁজো কলকলিয়ে উঠবে। ধরিত্রীর বুকে নেমে আসবে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ধারা। ফলবে প্রচুর শস্য। সোনারঙ-এর ফসলের স্বপ্নে মন তাদের বিভোর। শস্যের কামনায় চোখে মুখে বিদ্যুতের শিহরণ। বীরভূম, বর্ধমান জেলার পল্লীঅঞ্চলে ভাঁজুই বা ভাঁজো পূজা উপলক্ষ্যে এই গান গীত হয়। ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে ইন্দ্রপূজার উৎসব। এর পরদিন হতেই সুরু হয় ভাঁজোর আচারপদ্ধতি। ইন্দ্রপূজার পরদিনই ইঁদ্‌তলার মাটি নিয়ে এসে নতুন সরা বা পাকাতালের ঘুঞরির মধ্যে সেই মাটি ও কিছু ইঁন্দুর কুড়ো মাটি অন্যান্য মাটির সাথে মিশিয়ে রাখা হয়। শনের বা কাল কলায়ের বীজ দিয়ে সরা বা ঘুঞরিটিকে পূর্ণ করা হয়।

ইন্দ্রপূজার পর আটদিন নিত্যপূজা চলে। গ্রামাঞ্চলে কিশোরীর দল প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে চাল, ডাল, সরষের তেল, নারকেল তেল ইত্যাদি ও নগদ পয়সা সংগ্রহ করে এই পূজার জন্য। আটদিন পরে 'ভাঁজুই' মায়ের জাগরণ পূজা। গ্রামের যে সমস্ত পুরুষ বা মহিলা জাগরণের দিন উপবাস করে তারা সকলে একত্রিত হয়ে পুকুরে স্নান করে। পুকুর হতে এক কলসী জল ভরে গ্রামে নিয়ে আসা হয়। আসার সময় ঢাক, কাঁসি, ধুপধুনা, শালুকের মালা, সিঁদুর ও পূজার অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে উপবাসীরা ভাঁজুই মাকে অনুসরণ করে। এইভাবে মায়ের বারি[৯] নিয়ে বাজনা সহযোগে উপবাসীরা গ্রামের সমস্ত পথ প্রদক্ষিণ করে। গ্রামের অধিবাসীগণ ভক্তিরসাপ্লুত মন নিয়ে এই দৃশ্য দেখে। যার মাথায় বারি থাকে তার ভর[১০] নামে। গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ভাজুই মাকে তার আঁটনে[১১] স্থাপন করা হয়। উপবাসী ছেলেমেয়েরা ভাঁজুই

৯। কলসীর জল।

১০। দেবীর প্রভাবে ঝোঁক।

১১। বেদী।

মা এসেছেন কিনা জানার জন্য 'বারি'র উপর কিছু ফুল রাখে। এই ফুল আপনা হতে উপবাসীর হাতে গড়িয়ে পড়লে জানা যাবে যে ভাঁজুই মা এসেছেন। ফুল পড়ার আগে উপবাসীরা তুলসীপাতা হাতে নিয়ে ভাঁজুই মন্ত্র পড়ে—

একপাতা তুলসী ভাজুই মা কুমারী
ভাজুই জাগো গো জাগো।
পায়েতে সোনার নুপুর বাজে ॥
ইন্দ্ররাজা ঠাকুর
কোন ঘাটে কোন দেবতা জাগো।

এই মন্ত্র পাঠান্তে উপবাসী ব্রতী হাত পেতে বসে থাকে এবং ফুল আপনা হতে গড়িয়ে পড়ে। এই আচারের মূলে আছে যাদুবিশ্বাস—যা অনার্য্য-মানস হতে উদ্ভূত। এই উৎসব উপলক্ষ্যে যে গান* গাওয়া হয় তার কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হ'ল—

॥ ১ ॥

গোয়ালেতে গরু নাই ভাই ঘুঙুর কেন বাজে
চাল[১২] পানে চেয়ে দেখি কেষ্ট ঠাকুর নাচে
ওপারে গাই বেয়াল[১৩] গাই-এর নাম হাসি
বাগালকে[১৪] গড়িয়ে দোবো পিতল বাঁধা কাঁসি
ও লাজের মাথা খাও
পিতল বাঁধা কাঁসি।

॥ ২ ॥

শালুক ভাঁটার ঘর করিলাম
নেকের পেকের[১৫] করে
কাল আনলাম পরের বেটি
ও লাজের মাথা খাও জলে ভিজে মরে।

---

* গানগুলি মালাডাং গ্রামনিবাসী পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল ও কাঁদরা গ্রামনিবাসী ভগবৎ মণ্ডলের নিকট প্রাপ্ত।

১২। ঘরের আচ্ছাদন।

১৩। প্রসব করলো।

১৪। রাখাল।

১৫। নড়বড়।

কাঁতরা[১৬] ভেঙে শাক বুনলাম শাক দলমল করে
শাক বিচে শৈকা[১৭] পেলাম সতীন কেঁদে মরে
ও লাজের মাথা খাও।

॥ ৩ ॥

মোড়লদের বাড়িতে ওল ফুলল্ছে
খেয়েছে কি না খেয়েছে
ও লাজের মাথা খাও
গলা লেগেছে।

॥ ৪ ॥

আম ধরে থোকা থোকা তেঁতুল ধরে বেঁকা
হায় হায় তেঁতুল ধরে বেঁকা
নামাল দেশে দেখে এলাম
ও লাজের মাথা খাও
রাঁড়ীর[১৮] হাতে শৈকা।

॥ ৫ ॥

মোড়লদের বাড়িতে ভাই শত ঝুড়ি আকড়া
মোল্লানকে কাঁধে নিয়ে
ও লাজের মাথা খাও
মোড়ল বাজায় লাকড়া।

॥ ৬ ॥

বেউল বাঁশে বাঁকখান তেউর লতার শিকে
কেষ্ট কাঁধে ভার দিয়ে চলিল রাধিকে
ও লাজের মাথা খাও।

॥ ৭ ॥

ভাঁজুই লো সুন্দরী মাটির লো সরা
আমার ভাঁজুইকে দেব ও মজার আচ্ছা বেশ

১৬। পুরোনো দেওয়াল
১৭। শাঁখা।
১৮। নিঃসন্তান বিধবা।

পঞ্চ ফুলের মালা
ও লাজের মাথা খাও।

॥ ৮ ॥

ও পারের নিমগাছটি নিম ঝলমল করে
ছোটঠাকুরের কোঁচা দেখে ও লাজের মাথা খাও
মন ছটফট করে।

॥ ৯ ॥

আলুন্দার বিলে রে ভাই বগাবগি চরে
বগার পায়ে জোঁক লেগেছে ও লাজের মাথা খাও
বগি হেঁকে মরে।

উপর্যুক্ত গানগুলি পাঠান্তে সহজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় তা হলো অনুষ্ঠানটি মূলত মেয়েদের। গানের ভাব ও ভাষা মেয়েলী। অধিকাংশ গানেই একটি নিম্নমধ্যবিত্ত বা অন্ত্যজ পরিবারের সহজ, সরল, গার্হস্থ্য চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গানগুলিতে ব্যঙ্গ বা আদি-রসিকতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও আছে। ভাঁজুইকে কখনওবা সুন্দরী কন্যারূপে কল্পনা করা হয়েছে আবার কখনওবা মাতারূপে। 'ও লাজের মাথা খাও' এই ধুয়াটি প্রতিটি গানেই পাওয়া যায়।

'ভাঁজো' সঙ্গীতের সাথে যে নৃত্য তাতে মুখ্যত গ্রামের কিশোরীরাই অংশ গ্রহণ করে। বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদিত 'ভাঁজো' মূর্তিকে কেন্দ্র করে চারপাশে কিছু মাটির পাত্র সাজিয়ে রাখা হয়। মাটির পাত্রে দীর্ঘ আট দিনের ব্যবধানে কাল কলায়ের ছোট ছোট গাছ বেরিয়েছে। পাত্রগুলিকে গোলাকারে সাজিয়ে তাদের কেন্দ্র করে কিশোরীবৃন্দ সাড়ী পরে ও তারপর মণ্ডলাকৃতিতে কোমর দুলিয়ে নৃত্য করে। এ নৃত্যে পাদকর্ম বা অক্ষিকর্ম নেই।

'ভাঁজুই' বা 'ভাঁজো' সম্পর্কে উচ্চবর্ণের সমাজে এক পৌরাণিক বিশ্লেষণ আছে। শক্রোত্থানের পর বিজয়ী ইন্দ্রের সম্মানে যে নৃত্যকলার আয়োজন হয় ভরতের নাট্যশাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে। শক্রোত্থানই অভিনয়-শিল্পের প্রথম সোপান। এই নৃত্যনাট্যের প্রথম শিল্পীর নামের অপভ্রংশ 'ভাঁজুই' বলে অনুমান করা হয়।

বোলান

বর্ধমান জেলার কাটোয়া অঞ্চলে, মুর্শিদাবাদ জেলার বিশেষ করে কান্দি অঞ্চলে

ও নদীয়া জেলার কিছু অংশে বোলান গানের প্রচলন দেখা যায়। এই উৎসব উপলক্ষে ব্রত, উপোস ও অন্যান্য আচারানুষ্ঠান চলে প্রায় সারা চৈত্র মাস ধরে; কিন্তু প্রধান ধর্মানুষ্ঠানগুলি পালিত হয় চৈত্র মাসের শেষ চারদিন। গ্রামের শিবতলায় অগণিত 'ভক্ত্যা'র দল উপোস করে গাজনোৎসব পালন করে। আর্য্যেতর সম্প্রদায়ভুক্ত গ্রামীণ সমাজের লোকেরা নেশায় বিভোর হয়ে সারা দিনরাত নৃত্যগীত করে। যদিও শিবই উপলক্ষ—কিন্তু গানের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলা। কোন উচ্চাদর্শের ভিত্তিতে এ গান রচিত হয় না। উচ্চাঙ্গের কোন ভাব বা তত্ত্বও পরিবেশিত হয় না। পৌরাণিক দেব-দেবীর উপাখ্যানে লৌকিক অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ রূপ আরোপিত হয় মাত্র।

চৈত্রমাসের যে কোন সন্ধ্যায় এতদঞ্চলে যে কোন গ্রামে শোনা যাবে যৌথ কণ্ঠে বোলানের গান। সমাজের যে অন্ত্যজ শ্রেণী—গ্রামের বাইরে যাদের বাস—তাদের কিশোর আর যুবকেরা এসে সমবেত হয় এক নির্বাচিত ঘরে। তারপর সুরু হয় গান। মূল গায়েন একটি পদ বলে—দোহারীরা যৌথ কণ্ঠে তার পুনরাবৃত্তি করে। এই বোলান গান চার প্রকারের। যথা—(১) পোড়ো, (২) ডাক, (৩) সাঁওতেলে ও (৪) পালাবন্দী।

পোড়ো

এই গানে যারা অংশ গ্রহণ করে তারা চৈত্রমাসের শেষে শ্মশান হতে মড়ার মাথা আনে ও তা তন্ত্রমতে শুদ্ধ করে নেয়। এই মড়ার মাথাকে কেন্দ্র করে সঙ্গীত সহযোগে সুরু হয় গৃধিনী বিশাল নৃত্য। শ্মশান জাগানো নৃত্য প্রভৃতি। দশবারোটি মড়ার খুলি মাঝে রেখে নৃত্যশিল্পীরা প্রথমে গোলাকৃতি হয়ে বসে। মুখে কালী, মাথায় বড় বড় চুল। বীভৎস তাদের সাজ। তারপর হাত, পা ও গ্রীবাভঙ্গী দ্বারা এমন একটি ভাবের সৃষ্টি করে যেন মনে হয় কতকগুলি শকুনি একত্রে শ্মশানে কোন মৃতদেহের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। যখন ওরা একে একে এসে সমাবেত হয় তখন মুখে ওদের ভয়াবহ চীৎকার। মুখে পৈশাচিক উল্লাস। যেন উৎক্ষিপ্ত শকুনিদলের কণ্ঠস্বর। যখন একে অন্যের সাথে মাংসের জন্য কলহে ব্যস্ত তখন সে এক বীভৎস দৃশ্য। শকুনি সুলভ অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে প্রতিটি ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট। তারপর চক্রাকারে নৃত্য, যেন এক ঝাঁক শকুনি গোলাকারে উড়ছে, আর মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। সমগ্র পরিবেশে তন্ত্রমতের প্রচ্ছন্ন প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। ঢাক ও কাঁসি বাজনায় সঙ্গে সঙ্গে গানও চলে :

আমার কোল ভরা ধন
কোলের মানিক কে কেড়ে নিল।
যার মরে কোলের ছেলে
সে কি থাকতে পারে ধৈর্য্য ধরে ॥
মায়ে কাঁদে—'বাবা, বাছা'—
ভগ্নী কাঁদে—ভাই—
পরের রমণী কাঁদে, আমারও কেউ নাই ॥

গলিত শবদেহ নিয়ে বীভৎস নৃত্য আজও চলে কুড়মুন ও কাঁদিতে। নৃত্যশিল্পীর মুখসজ্জায় দক্ষতার সুস্পষ্ট ছাপ। প্রথমে সম্পূর্ণ মুখ নীলবর্ণে রাঙানো হয়। তার উপর বিচিত্র বর্ণে শিল্পীর তুলি চলে! অনেকটা কথাকলি নৃত্যসজ্জার মত।

জাক

সাধারণত এই উৎসবের প্রায় একমাস পূর্ব হতে বাউরী, বাগ্দী, সদ্গোপ শ্রেণীভুক্ত লোক অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশজনকে দলে নিয়ে গানের মহড়া চালায়। প্রত্যেকের হাতে থাকে একটি করে লাঠি। লাঠিগুলি প্রথমে একত্র রেখে সারিবন্দী হয়ে নাচগান করে। প্রত্যেকের পরণে জাঙিয়া, কোমরে ঘণ্টা। হাতে লাঠি নিয়ে কখনও সারিবন্দী ভাবে, কখনও মণ্ডলাকৃতি হয়ে নৃত্য সুরু করে। সাথে গানও চলে :

একদিন গোকুল বিন্দাবনে
দিনে আঁধার হল ক্যানে
গোপাল—তুই নাই বলে।

সাঁওতেলে

এই গানে নাচের অংশই মুখ্য। সদ্গোপ, বাউরা, বাগ্দী এমনকি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবরাও এ নাচে অংশগ্রহণ করে। বাদ্যযন্ত্র থাকে—ঢোল, বাঁশী, মাদল, করতাল, জয়ঢাক, ইত্যাদি। গলায় 'কাঁঠির মালা'। পরণে কালো জাঙিয়া, কালো গেঞ্জি। হাতে মালা, মাথায় লাল ফিতেয় বাঁধা হাস-মুরগীর পালক। কোমরে ঘণ্টা ও হাতে তীর ধনুক। বিচিত্র সাজ। কোন কোন ক্ষেত্রে দলে প্রায় ১০০ জন লোকও থাকে। প্রথমে সুরু হয় উদ্দাম যৌথ নৃত্য। তারপর সুরু হয় সঙ্গীত—

জয় মা কালী আবার আসবে একবার
এস মা তুমি বিনাযন্ত্রে রাগিণী দাও জননী।
ওগো মা বীণাপাণি এসো মা গৌরী নন্দিনী,
হংস পরে থাকো তুমি গো শতদলবাসিনী
এসো মা গৌরীনন্দিনী ॥
আদ্যাবতী মহাশক্তি, ভক্তিদানে দাও মা মুক্তি
জানি না তোর ভজন ভক্তি অজ্ঞানের কর গতি ॥
সন্তানে সান্ত্বনা কর নিজ গুণে
বসো মাগো রত্নামায়া আসনে।
মক্ষীরূপে চণ্ডীপাঠে ভুল করে রাবণে
অকালেতে দেখা দিল রামে ॥
... ...
আয় আয় উমা, আয় আয় আয়, কাল সমন এল নিকটে
জানাই মা তাই তোমার তটে পরেছি বিষম সঙ্কটে।
কি করি উপায়—উমা আয় আয় আয় ॥
(তখন) ধ্যানযোগে দেবীর আসন পড়িল গো টলিয়া
ভক্তের কারণ মর্তে ভুবনে গো এসে দিল দেখা ॥

গান শেষ হলে এই দল নাচতে নাচতে অন্যত্র চলে যায়।

পালাবন্দী

এই শ্রেণীর বোলান গান অনেকটা যাত্রার মত। পুরুষেরা মেয়েদের সাজসজ্জা পরে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করে। অন্ততঃ ১৫।১৬ জন শিল্পী এতে অংশ গ্রহণ করে। দুখানি ঢোল, দুটি করতাল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়। একজন মুখ্য গায়েন বা 'বোলানদার' থাকে। পালাগান হয়—কলঙ্কভজন, নৌকাবিলাস, মাথুর, সুবলমিলন, দাতাকর্ণ, সীতাহরণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সাবিত্রী-সত্যবান, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। এই জাতীয় পালাগানের চারটি পর্য্যায় থাকে—পর্য্যায়গুলি যথাক্রমে বন্দনা, বক্তৃতা, পাঁচালী ও পয়ার। নিম্নে উদাহরণ দেওয়া গেল—

বন্দনা হররমা মাতা আয় বসে রই তোর আশায়।
এ দীনের প্রতি হও সদয় মিনতি জানাই তোমায় ॥
অশিবনাশিনী বিশ্বমাতঃ পদে তোমার করি নিবেদন।

আমি জানি না সাধন তোমার ভজন ॥
নিজগুণে সরল প্রাণে দিও শ্রীচরণ মোদের এই আকিঞ্চন।
ওগো তারা, চরণ ছাড়া করো না এখন ॥

বক্তৃতা

রাজা— রাণী চল, আমরা সত্যবানকে নিয়ে বনে যাই
তাছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নাই।
ত্যজি রাজ্য ধন চল যাই বনে
কেমনে ভ্রমিব বনে অন্ধ নয়নে।

রাণী— মরণের ফাঁসি লাগলো আসি, রাজা তুমি প'ড়লে ঘোর বিপাকে।
আমি তোমার চরণ বিনে কিছুই তো জানি না—
সঙ্গে নাও আমাকে ॥

পাঁচালী কাঠ কাটিতে এসে কাননে তোমার এ ভাব হ'ল কেমনে
মুখে বাক্য নাহি সরে বল কিসের কারণে ?
হায়রে বিধি কি করিলি দিয়ে নিধি হ'রে নিলি
আজি মোরে ফেলাইলি প্রজ্জলিত আগুনে।

পয়ার তোমা ভিন্ন গতি নাই ওহে হরি দয়াময়
কোথায় হে করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু হরি
অভাগিনী ডাকে তোমায় দুটি কর জুড়ি
অভাগিনী ডাকে তোমায় অতি সকাতরে
অবলা নারী আমি রক্ষা কর মোরে
তোমা ভিন্ন গতি নাই ওহে হরি দয়াময়।

এই বোলান উৎসবে নৃত্যগীতের বিশেষ সমারোহ দেখা যায় কাটোয়ার কাছে উদ্ধারণপুরের ঘাটে। বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় সমস্ত জাগ্রত শিবঠাকুরকে দোলায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রামের 'ভক্ত্যারা' সারা পথ বোলানের নৃত্য-গীত করতে করতে এসে সমবেত হয় এই ঘাটে। পথে পথেই দিনরাত কেটেছে কিন্তু কারো মুখে কোন ক্লান্তি নেই। সমান উন্মাদনা নিয়ে উপবাসী 'ভক্ত্যা' ও উৎসাহী গায়কের দল নৃত্য করে। দলের পর দল বিকট শব্দ করে তাদের আগমন-বার্তা ঘোষণা করে। লাঠি উঁচু করে নাচাতে নাচাতে এমন ভাবে প্রবেশ করে যেন রাজ্য জয় করে এসেছে। শক্তির খেলায় মেতে উঠেছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একটি করে দল আসে বিচিত্র রূপসজ্জায়। দর্শনার্থীর দল হতে প্রশ্ন আসে—

'কোথাকার শিব গো ?' যথারীতি উত্তর আসে। নেশায় বিভোর মেয়েপুরুষের দল তালে তাল দিয়ে নেচে চলে। উদ্দাম গতির গোষ্ঠিবদ্ধ নৃত্য। মুখে কখনওবা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গান, কখনওবা আধুনিক কোন ঘটনাপ্রবাহের গান।

এই বোলান গান দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এক হল কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি বিষয়ক; দুই হল আধুনিক ঘটনাবলী নিয়ে ব্যঙ্গগীতি। সুরেও অনেক সময় চলচ্চিত্র সঙ্গীতের অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। গানের সুরুতে থাকে বন্দনা।

॥ ১ ॥

গৌরীসুতে প্রথমেতে করি বন্দনা
যার চরণ নিলে স্মরণ বিঘ্ন রহে না।
এসো শ্রীমধুসূদন বিপদভঞ্জ রাধিকা প্রাণধন হরি
অনাথবান্ধব শ্রীরাধিকাবল্লভ এ দাসে দাও চরণ তরী।

॥ ২ ॥

করপুটে হরগৌরীর বন্দিলাম শ্রীনন্দনে
সকল বিঘ্ন হয় বিনাশন শুনি তব নামগুণে ॥
ওগো শ্বেতবরণী শতদলবাসিনী, এসো মা হংসবাহিনী
মম কণ্ঠে এ সঙ্কটে গো উদয় হ'য়ে বলাও মধুর বাণী ॥
অনুরাগের বীণাখানি গো হৃদকমলে বাজাও বসি শুনি মধুরধ্বনি গো।

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গান :

আর কি সখি শ্যামের সনে হ'বে আমার দেখা।[১৭]
হৃদয় ভরা পোষা পাখী আমার সে বঁধুয়া ॥
ধৈর্য্য না ধরে সখি কালো বঁধুর কারণে যাতনা সহে না প্রাণে।
'কাল আসবো ব'লে' গেল গো হো—
কৈ সই এলোনা যাতনা সহেনা প্রাণে ॥
চল ললিতে আমার সাথে নাগর লাগিয়া যাব দূর দেশে।
পাগল বেশে দেশে দেশে দেখবো আমার প্রাণনাথে ॥
বুকের মাঝে তুষের আগুন দিল কালা বিরহ অনলে উঠে জ্বালা।
দয়ামায়া নাইকো প্রাণে এমনি কঠিন হিয়া
নিঠুর হ'য়ে গেলগো চলিয়া ॥

১৭। আখড়া গ্রামের দলের নিকট প্রাপ্ত।

কালোবরণ তোমার কারণ বাঁচে নাক' জীবন।
দিবানিশি জ্বলছে আমার রত্নামায়া আসন ॥
ধরিয়া বৃন্দের করে, কয় রাধে বিনয় করে—
'শ্যামকে সই এনে দাও মোরে।'
এলে পরে রাখবো ধরে যতন করে বঁধুকে আমি হৃদয় মাঝারে ॥
যায় যায় যায় বৃন্দে যায় যায় যায়।
যাবো গো মথুরা ভুবন আনিতে সেই কালোবরণ ॥
পদধূলি দিয়ে মাথে, দাও গো বিদায়,
বৃন্দে যায় যায় যায়।
(তবে) মথুরা পথেতে বৃন্দেগো শুভযাত্রা করে
কালাচাঁদে আনবো বলেগো বাসনা অন্তরে।

এই বোলান গানে কখনও কখনও হিন্দীপদও পাওয়া যায়। যেমন—

সেলাম রাখি হে মাইজী তুঁহারী চরণে
যুগোলকা মুরতি হামকো দেখ দে নয়নে।

এই জাতীয় গানের শেষে দল পরিচয় থাকে। যেমন—

বড় কাঁদরা মোদের বাড়ী গো
পুর্বপাড়া বাড়ি মোদের, দলের পরিচয়।

অথবা,

ভুটিগাছি মালা দেন গো মুহুরীর গলে
দলপতি আনন্দ ঘোষ আমাদের দলে।
মদন হয় বাজিয়ে,
আনন্দ শান্তিকে নিয়ে বোলানের দল করি আমরা।
বাড়ী মোদের আখড়া গ্রাম গো উত্তরপাড়া হয়
'দ্যুতি সংবাদ' পালা মোদের শেষ হয়ে যায়।

অত্যন্ত লঘু সুরে আধুনিক ঘটনা প্রসঙ্গিত গান গাওয়া হয়। যেমন—

এ বছরে বোলান গেয়ে
সুখ পেলাম না মনে গো
ভীষণ 'রাইঅট' (Riot) লেগেছে
ভারত আর চীনে গো।

১৯৬২ সনের ভারত-চীন সংঘর্ষের কথা সুদূর পল্লীর লোকসঙ্গীতেও এসেছে।

আধুনিক গ্রাম্য বধূদের ইঙ্গিত করে গান গাওয়া হয়।

বৌ আমাদের টাউনের মেয়ে
মন সরে না পাড়াগাঁয়ে
মনে পড়ে সিনেমার হাউস ক্ষণে ক্ষণে।
ফুলেল[২০] তেলে খোঁপা তুলে
বৌমা বাঁধছে ঝুটি চারবেলা
গোয়াল কাড়া,[২১] গোবর ঠেলা গো
বৌ তো আমাদের পারে না
হাতের গন্ধ যাবে না।

এই গান বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র যে গাজন গান চালু আছে তা এই বোলানেরই অনুরূপ। তবে গাজনের গানে উদ্দাম প্রকাশভঙ্গী নেই।

করম্ পূজার গান

বাঙালা হিন্দুর বৎসরের শ্রেষ্ঠ উৎসব যেমন দুর্গাপূজা, মুসলমানদের যেমন ঈদ, খ্রীষ্টানদের যেমন ক্রীসমাস; তেমনি বহু আদিবাসীর উৎসব—'করম' পূজা বা 'কার্মাধার্মা'য়। এইসব আদিবাসীদের নানাবিধ কামনাবাসনার স্ফুরণ হয় এই উৎসবে। সন্তানের কামনা, শস্যের কামনা, যুদ্ধজয়ের কামনা। সব। যখন ওরা করম উৎসব প্রতিপালন করে তখন অন্যান্য বর্ণের হিন্দুরা 'ইন্দ্রপূজা বা 'ইদ' পর্ব অনুষ্ঠান করে থাকে। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন যে করম পূজা ইন্দ্র-পূজারই অনার্যীকৃত রূপ। এর স্বপক্ষের যুক্তিগুলি নীচে দেওয়া গেল। কিন্তু বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের ধারা পর্য্যালোচনা করলে ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতিনীতি অনুধাবন করলে এ পূজা যে অবৈদিক আর্য্যেতর সম্প্রদায়ের বর্ষা উৎসব তা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

বাঙালীর জীবনে ইন্দ্রপূজার প্রসার এত বিচিত্র যে তা বিস্তৃত আলোচনার দাবী রাখে। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের উদ্ধৃতিতে ও ঐতিহাসিকের ব্যাখ্যায় ইন্দ্র কখনও বৃষ্টির দেবতা, কখনও যুদ্ধের দেবতা।

২০। সুগন্ধ।
২১। পরিষ্কার করা।

ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে এই পূজার অনুষ্ঠান। পঞ্জিকায় এই পূজার নাম 'শক্রোত্থান'। পৌরাণিক কাহিনী মতে রাজ্যচ্যুত ইন্দ্র বামন দেবতার প্রসাদে দৈত্যরাজ বলীর হাত থেকে স্বর্গরাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন। ঐদিন শক্র অর্থাৎ ইন্দ্রের পুনরুত্থান হয়েছিল—তাই তিনি বিধান দেন যে—যে রাজা এই ইন্দ্রধ্বজপূজা করবেন তাঁর ধন, বল ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে। এই পূজা রাজরাজরাদের বিজয়ধ্বজ পূজা।

দেবতাদের সাথে অসুরের যুদ্ধ মীমাংসা হওয়ার পর ঘটনাকে নাট্যাকারে উপস্থাপিত করার জন্য ব্রহ্মার উপর ভার দেন দেবরাজ ইন্দ্র। ব্রহ্মা 'দেবাসুর সংগ্রাম' নাটক প্রস্তুত করে ইন্দ্রকে উপহার দেন। ইন্দ্র দেবতাদের দ্বারা এই নাটক অভিনীত হবে না মনে করে মর্ত্যের ভরত ও তাঁর শতাধিক শিষ্যের উপরে অভিনয়ের ভার অর্পণ করেন। ভাদ্র মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে ইন্দ্রের মুকুট উপরে স্থাপন করে এই অভিনয় সুরু হয়েছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্ররাজের যে উল্লেখ আছে তা হল—'নন্দ কহিলেন, হে তাত! ভগবান ইন্দ্র পর্জন্যরূপী, মেঘসকল তাঁহার প্রিয়তম মূর্তি, ইহারা জীবগণের প্রীতিসাধক প্রাণপ্রদ সলিল বর্ষণ করিয়া থাকে। হে বৎস, সেই মেঘ সকলের প্রতি যে জলবর্ষণ করিয়া থাকে সেই জলে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, আমরা তদ্দ্বারা তাহার যজ্ঞ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ ধর্ম, অর্থ ও কামসিদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্যদ্বারা জীবন ধারণ করে। পুরুষদের যে কোন বৃত্তি বা ব্যবসায় আছে—বর্ষা ঋতু সেই সমুদয়ের ফলোৎপাদক।' মানুষের বৃহত্তর কল্যাণসাধনে শস্যোৎপাদনের জন্য ইন্দ্ররাজের বৃষ্টিদাতার ভূমিকাই এখানে বিশেষভাবে প্রকাশিত।

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'লোকায়তদর্শন' গ্রন্থে ইন্দ্রকে ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের সাথে তাঁর যুদ্ধজয়ের বাসনার যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। ঋগ্বেদের যুগ থেকে বৈদিক কবিদের বন্দনায় ইন্দ্রের গৌরব বরুণের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

দেবরাজ ইন্দ্র সম্পর্কে ঋগ্বেদের কয়েকটি উদ্ধৃতি—

: হে ইন্দ্র তুমি শত্রুক্ষয়কারক, অতএব বৃষ্টিপূর্ণ ত্বকরূপে জলের আবরণকে (মেঘকে) ভেদ করিয়া (জল) সেচন কর এবং মর্ত্যের ন্যায় গমনশীল মেঘকে ধরিয়া বৃষ্টিশূন্য করিয়া ছাড়িয়া দাও যেমন কোন বীর গমনকারী শত্রুকে নিগৃহীত করে। ১. ১২৯. ৩.॥

: হে ঋত্বিকগণ—আমাদিগের যজ্ঞে ইন্দ্রকে কামনা করি। ইন্দ্র আমাদের

সখা, সর্বগামী ও শত্রুদের অভিভবকারী এবং তিনি আমাদিগকে অন্নসমূহদ্বারা যুক্ত করেন। তিনি আমাদিগের সহায়ভূত হইয়া শত্রু বিনাশ করেন। ১. ১২৯. ৪ ॥

: হে ইন্দ্র : ওষধিসমূহ ও জল তোমারই নির্মিত ৩. ৫৫. ২২

উপরের বক্তব্যে ইন্দ্রের শত্রুবিজয়ী ও বৃষ্টিদাতা উভয়রূপেই পরিচয় আছে। লুণ্ঠন, যুদ্ধজয় ও শস্যোৎপাদনের কামনার স্ফুরণ প্রাগৈতিহাসিক যুগে। আর্য্যেতর সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে শিকারী, পরবর্তীকালে যুদ্ধজীবী ও কৃষিকর্মের উদ্গাতা। উত্তরকালে এই কামনা আর্য্য মানসিকতায় সংক্রামিত হয়েছে বলেই ধারণা।

'পূজাপার্বণ' গ্রন্থে ৺যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন : 'জ্যৈষ্ঠ শুক্লানবমীতে মহাবিষুব হইয়াছিল। ইহার ৩ মাস ৩ তিথি পরে অর্থাৎ ভাদ্র শুক্লাদ্বাদশীতে রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইয়াছিল। সে তিথির নাম বামনদ্বাদশী। সেদিন ভারতের কোন কোন দেশীয় রাজ্যে ইন্দ্রধ্বজ রোপণ নামক বৃহৎ উৎসব হয়। সেদিন রাজা অমাত্য ও প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়া এক দীর্ঘধ্বজ রোপণ করেন। ধ্বজের শীর্ষে এক দীর্ঘ পতাকা থাকে। কোন দিন রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইবে—তাহা ধ্বজের ছায়া দ্বারা এবং বায়ুপ্রবাহের দিক পতাকা দ্বারা নির্ণীত হইত।' বহুপূর্বে চেদী বংশের রাজা উপরিচর বসু এই পূজার প্রবর্তন করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশের রাজা প্রজাদের সাথে মিলিত হ'য়ে এই পূজা করেছেন। যদি এই পূজা বিজয়োৎসব হয় তাহলে প্রজাবর্গ রাজার আনন্দের স্বার্থে এই উৎসবে মিলিত হ'তেন; আর যদি এই পূজা শস্যকামনায় বৃষ্টির আবাহন হয় তাহলে রাজাই প্রজাদের স্বার্থে এসে মিলিত হ'তেন।

৺যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' গ্রন্থে লিখেছেন— 'সূর্যের যে শক্তি দক্ষিণায়ন আরম্ভদিনে বৃষ্টিদাতারূপে প্রকাশিত হন—তিনিই ইন্দ্র। সেদিন প্রত্যক্ষ সূর্যের নাম বিবস্বান। ইহার পরদিন ইন্দ্রযজ্ঞ হইত।...ইন্দ্র বৃত্রকে পূর্ণিমায় নিহত করিয়াছিলেন। বৃত্র কে? স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বৃত্র বৃষ্টিরোধকারী, দীর্ঘদেহ, হস্তপদহীন দিব্যলোকে অবস্থিত দৃশ্যমান উজ্জ্বল কোন এক পদার্থ। কেহ মনে করিয়াছেন বৃত্র অন্ধকার। সূর্যরূপে সে অন্ধকার ভেদ করিয়াছেন—মরুদগণ তাহার সহায় হইয়া ভূতলে জলধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন।'

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের পূর্বেও যে এই পূজার প্রচলন ছিল তার প্রমাণ লক্ষ্মণসেনের সভাকবি শ্রীগোবর্দ্ধন আচার্যের গ্রন্থে ও জীমূতবাহনের 'কালবিবেক'

গ্রন্থে পাওয়া যায়। গোবর্দ্ধন আচার্য লিখেছেন: 'হে শক্রধ্বজ! যে শ্রেষ্ঠীরা (একদিন) তোমাকে উন্নত করিয়া গিয়াছিলেন সম্প্রতি সেই শ্রেষ্ঠীরা কোথায়? ইদানীং কালে লোকেরা তোমাকে (লাঙ্গলের) ঈষ অথবা মেঢ়ি (গরু বাঁধিবার গোঁজ) করিতে চাহিতেছে।' এই উদ্ধৃতি হইতে মনে হয় যে ইতিপূর্বে এই পূজা ধনী বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছিল। বণিক সম্প্রদায়ের লক্ষ্য সম্পদ বৃদ্ধি—দেশের সীমানা বৃদ্ধি নয়। বাঙালী জীবন তখন কৃষিনির্ভর বা পশুপালননির্ভর সভ্যতা অতিক্রম করে বাণিজ্যনির্ভরতার দিকে পা দিয়েছে। ঐ যুগের শ্রীবৃদ্ধির মূলে শস্যকামনা ছিল না বলেই মনে করা যেতে পারে।

একথা হয়তো ঠিক যে বাঙালী সভ্যতা আর্য্যীকরণের সঙ্গে সঙ্গে রাজরাজরাদের যুদ্ধ জয় ও বিজয়োৎসবের প্রতীক হিসাবে এই পূজার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থাৎ দেশ যখন রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের যুগ অতিক্রম করে জমিদারতন্ত্রে এসে পৌঁচেছে তখন এ পূজার উদ্দেশ্য বদলে গিয়েছে। জমিদারেরা প্রজাদের স্বার্থে বৃষ্টির জন্য এ পূজার অনুষ্ঠান করতেন। এ সম্পর্কে সুসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'গ্রামের কথায়' লিখেছেন—'পার্শ্ব একাদশীর পরের দিন ইন্দ্রদ্বাদশী। এইদিন বাঙলার প্রতিটি মৌজায় জমিদারী উচ্ছেদের পূর্ব পর্য্যন্ত ইন্দ্রপূজা হত। হত বৃষ্টির জন্য।' কারণ বৃষ্টি ছাড়া সৌভাগ্য নেই। অতি-বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি জনজীবনে আনে অনিশ্চয়তা, আনে বিপর্যয়। এ সম্পর্কে শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত "রেইন ইন্ ই গুয়ান লাইফ এণ্ড লোর"-গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

এই ইন্দ্রপূজা শুক্লাদ্বাদশীর বদলে শুক্লাত্রয়োদশীর দিন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাক, ঢোল, মাদল বাজাতে বাজাতে 'কার্মা' অর্থাৎ করমের ডাল, ভেলা আর কুশ নিয়ে আসে বন হতে যেখানে গ্রামের সমস্ত মেয়ে পুরুষ একত্রে জোটবদ্ধ হয়ে যায়। ফিরে এসে সেই 'কার্মা' ইন্দতলায় প্রতিষ্ঠা করে। তারপর হয় মুরগী বলিদান। সারারাত্রি ও পরদিন দুপুর পর্যন্ত এই 'কার্মাকে' কেন্দ্র করে চলে মেয়েপুরুষের যৌথ নৃত্যগীত। চক্ষে নেশার উন্মাদনা। শস্যকামনায় দেহমন উন্মুখ। জলধারা প্রবাহের আশায় উৎসব আবেগ মুখর।

আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর দিন হতেই এই পূজা উপলক্ষে নাচগান সুরু হয়। লক্ষণীয় যে অম্বুবাচীর দিন ধরিত্রী রজঃস্বলা হয়। প্রকৃতির সন্তানকামনা আদিবাসীর শস্যকামনায় পর্যবসিত হয়। পূজার উপকরণ আতপচাল আর সিঁদুর।

মহুয়া মাতাল মন ভুলে যায় সংসারের অভাব অনটনের কথা। মেয়েরা পরস্পর পরস্পরের পিঠে হাত রেখে অর্দ্ধবৃত্তাকারে একসাথে নাচে। একবার ঊর্ধাঙ্গ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয় আর একবার পিছিয়ে নেয়। সঙ্গে চলে নিখুঁত পদকর্ম। পুরুষদের দল মাদল বাজায়। বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নৃত্যশিল্পী অপূর্ব এক ছন্দোময় পরিবেশের সৃষ্টি করে। ওরা গেয়ে চলে—

সাতো ভাই রাহালে আর সাতো গতান[২২] রাহালে
তো সাতদিন সাতরাতে ঝুমার[২৩] খেলে ঝুমার খেলতে খেলতে
আণিজ্যার বাণিজ্যার শিকার খেলতে গেলে।
শ্যামসুন্দর বিন্দাবনমে হরির মারে হে, ঘোরাহর মারে হে
বরাহর মারে হে মারতে মারতে আলামারা[২৪] ভেপল
তখন কেঁদপাকা, পিয়ালপাকা, বৈচীপাকা খাই লেলে হে।
পানিপিয়াস সে আর রহেল না পরে তো পানি নাহি মিলেল হে
তো চলি গেলে হে সাত সমুদ্দুরমে
সাতদিন সাত রাত চাল্‌তে চাল্‌তে এক নদী ভেলে।
নদীসে কুঁয়া কাড়ে হে কুঁয়া কাড়ে তো পানি মিললে রকত্‌।
তো ফিন ঘুরকে আও হে আও হে স্মরণশক্তি করে হে নাচন কুঁদন করে হে
তো দিন চালি গেলে হে চাল্‌তে চাল্‌তে চালি গেলে হে
সাতদিন সাতরাত সমুদ্দুর পানি ভেপল আচ্ছা
তো পেটভর খাই লেলে হে।

গানটিতে প্রথমে জলের অভাবে শুকানো নদীনালার কথা, তৃষ্ণার্তের কষ্ট ও পরে সমুদ্রে জলপানে তৃষ্ণা নিবারণের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। গানের ভাষায় বাঙলা মুণ্ডারী ও ভোজপুরীর সংমিশ্রণ দেখা যায়। এ গান ওঁরাও সম্প্রদায়ের। ওঁরাও সম্প্রদায়ের আদি নিবাস ছিল ছোটনাগপুর। এই সম্প্রদায়ের নামের পদবী সুচী বা সর্দার। প্রকৃত পদবী 'ওড়াং'। ছোটনাগপুর এলেকায় এদের পূর্বপুরুষ বসবাস করে। ১৫।১৬ বৎসর অন্তর এদের একটি বিরাট উৎসব হয় 'নাথহজরনা'। ফাল্গুন মাসে হয়। পুরোহিত পাতায় তেল মাখিয়ে পূজা

২২। বোন।
২৩। ঝুমুর।
২৪। ক্লান্ত।

সুরু করে। মহিষ বলিদান হয়। মোড়লের বিচার মানে। স্বাঙাৎ প্রথা চালু আছে. কন্যাপক্ষকে বিবাহে পণ দেয়। পাত্র-পক্ষের মোড়লের সাথে মদের দোকানে বিবাহের কথা জানাজানি হয়। কন্যাপক্ষ নেয় সাড়ে বাইশ টাকা। এছাড়া মা, দাই ও কনের কাপড় লাগে। বিবাহিতা মেয়েরা সিঁদুর দেয়। শাঁখা পরে না তবে লোহার নোয়া পরে। মৃতদেহ দাহ করলে একমাস অশৌচ পালন করতে হয়। 'বিনদোষী হওয়ার জন্য বাইশটি গ্রামের লোককে খাওয়াতে হয়। মাটিতে পুঁতে সংকার করলে তিন দিন পালন করতে হয়। পুরোহিত ও মন্ত্র প্রথার প্রচলন আছে। এদের যারা আদি বংশধর—তাদের কানে ফুটো তাতে তালপাতার গুটি। কাপড় পরার ধরণ পৃথক। সারা দেহে উল্কি। পিঠে ছেলে বাঁধে। নীচে পানছি উপরে পানালার পরে। ওঁরাওদের সম্পর্কে সম্প্রতি নৃতত্ত্ববিদেরা নানা গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করে চলেছেন। রাঁচির 'ম্যান-ইন-ইণ্ডিয়া' কলিকাতার 'ফোকলোর' নিয়মিত পাঠ করলে ওদের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যাবে। বাঙলার পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বাঙলার সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বাঙলার লোকসংস্কৃতিকে সমুন্নত করেছে। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সাংস্কৃতিক উপকরণ আদানপ্রদান, মিশ্রণ-সংমিশ্রণ, গ্রহণ ও বর্জনের ফলে বাঙলার লোকবৃত্ত পরিপুষ্ট হয়েছে। প্রতিবেশী সংস্কৃতির নানা উপাদান গ্রহণে দ্বিধাহীন মনোভাবই বাঙলার লোক-সংস্কৃতির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য এবং বীরভূম জেলা এর একটি দৃষ্টান্ত। এই মিশ্রিত বঙ্গসংস্কৃতির গানে বৃন্দাবনের শ্যামসুন্দরের উল্লেখ আছে। কারণ চৈতন্য আন্দোলনের সময় ছোটনাগপুর অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম প্রসারলাভ করেছিল। নৃতত্ত্ববিদপণ্ডিতগণ এ সম্পর্কে নানা বিচিত্র তথ্য পরিবেশন করেছেন।

উৎসবে মুরগী বলিদান এদের 'টোটেম' বিশ্বাসেরই অবদান। মুরগী উর্বরা শক্তির প্রতীক। বাঙালী মেয়েরা সন্তান কামনায় 'কুক্কুটী ব্রত' পালন করে। মুরগী অনেক ডিম প্রসব করে। তাই সন্তানের কামনা বা অধিক শস্যের কামনায় ওঁরাও, সাঁওতাল ইত্যাদি সম্প্রদায় মুরগীকে একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ বলে মনে করে।

ইন্দ্রপূজা সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। নিম্নে এ সম্পর্কে আরও কিছু বক্তব্য রাখছি। সে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুনরায় আমরা আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়ের সাহায্য নিচ্ছি, তিনি লিখেছেন: 'আর্য্যরা দাসজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতেন, যুদ্ধের পূর্বে ইন্দ্রের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেন।' দেখা যাচ্ছে

ইন্দ্রের অনুগ্রহে আর্য্যেরা বিজয়ী ও দাসজাতি বিজিত। তাহলে প্রশ্ন উঠে যে ইন্দ্রের কৃপাবলে আর্য্যেরা দাসজাতিকে পরাজিত করেছে। সেই দাসজাতি ইন্দ্রকে কিভাবে উপাস্যদেবতা হিসাবে মেনে নেবে এবং তাদের সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসবে স্বীকৃতি দেবে? মনে করা যেতে পারে যে রাজার ইচ্ছায় বা পরবর্তীকালে জমিদারের ইচ্ছায় প্রজাকে এই উৎসবে মিলিত হতে হয়েছে। কিন্তু সেখানে পরাজয়ের অসম্মান নিয়ে উৎসবের সাথে অন্তরের যোগসাধন করা যায় না। তবে ব্যাপার কি?

শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন : "ইন্দ্রধ্বজ উৎসব মূলত আদিমজাতির বিজয়োৎসব। কৌমপতি বা গোষ্ঠীপতি (পরবর্তীকালে রাজা) যে অধিকার পেতেন তার প্রতীক ঐ ছত্র।...তারই সঙ্গে আদি অকৃত্রিম বৃক্ষপূজা ও ফলন শক্তি বৃদ্ধির কামনা উৎসবও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে।"... এই আদিম কৌম উৎসব পরবর্তীকালে দেবরাজ ইন্দ্রের ধ্বজোৎসবে পরিণত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে ধনবল ও সুখসমৃদ্ধির কামনা উৎসব ও বিজয়োৎসবে রূপ নিয়েছে।

সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, রাজবংশী প্রভৃতি কোমবদ্ধ অধিবাসীদের কোন ধর্মানুষ্ঠানই ধ্বজ বা ধ্বজা ছাড়া অনুষ্ঠিত হয় না।

পূজার স্থান গ্রামের প্রান্তে, যেখানে অন্ত্যজ শ্রেণীর বাস। কাল বর্ষা। নৃত্যগীতে মুখ্য অংশগ্রহণকারী হচ্ছে আদিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেণী—ক্ষেতের ফসলের সাথে যাদের যোগ নিগূঢ়। এগুলির বিবেচনান্তে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে, অধিক শস্য কামনায় ও ফলনশক্তি বৃদ্ধির জন্য আর্য্যেতর সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা 'করম'ই আর্য্যদেবতা দেবরাজ ইন্দ্র। তাই সঙ্গীতের মাঝে প্রার্থনা জানায়—

হারে রাজা কীড়া হারে দেশ কীড়া
কাটাই মম্নান ধ্বজা চাই
হে আগাহে—চায়হো
কিয়া জরু মাইয়া পাথাহে চ্যায়

অর্থাৎ, হে গাছ, পতাকা বেঁধে তোমারই ধ্বজা করছি। অকাল দুর্ভিক্ষ দূর করে দাও। হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশানটি নীচে না বেঁধে বৃক্ষের উপরই বাঁধা হয়েছে।

ভাদু

ভাদুগান সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাঙলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে

বলেছেন—"জনশ্রুতিমূলক ক্ষীণ কাহিনী যদিও এই লোকসঙ্গীতের ভিত্তি তথাপি ইহার কাহিনী ইহার মধ্যে গৌণ—বাঙলার প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশই ইহার মুখ্য অবলম্বন। ভাদ্রমাসের সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এই অঞ্চলের সকল শ্রেণীরই প্রধানতঃ কুমারী মেয়েরা ভাদু নামক দেবীর প্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া এই লোকসঙ্গীত গাহিয়া থাকে। এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া ভাদ্রের ভরা প্রকৃতির পটভূমিকায় কুমারী হৃদয়ের বিচিত্র সুখদুঃখের অনুভূতি ব্যক্ত হয়। এই শ্রেণীর লোকসঙ্গীত এই অঞ্চলের কুমারী মেয়েদের মধ্যে কি ভাবে উদ্ভূত হইল? এই অঞ্চলেরই সংলগ্ন ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে মধ্যভারতে পঁড়জাতি অধ্যুষিত সমতলভূমি পর্যন্ত যে দ্রাবিড় ও মুণ্ডাভাষী উপজাতি সমূহ বাস করে, তাদের মধ্যে ভাদ্রমাসে করম নামক এক বিশিষ্ট নৃত্যগীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।...যদিও ইহার একটি আচার অরণ্য হইতে করম্ (কদম্ব) বৃক্ষের শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে কাটিয়া আনিয়া তাহা কেন্দ্র করিয়াই নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান তথাপি ইহা সকল উপজাতির একটি প্রকৃতি উৎসব বা বর্ষা উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে। মধ্যভারত হইতে বাঙলার পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া বর্ষা প্রকৃতি উপজাতীয় অধিবাসীর মনে যে আনন্দের স্পন্দন জাগাইয়া তোলে—তাহার তরঙ্গ বাঙলার পশ্চিম সীমান্তের মধ্যবর্তী কুমারীদিগের হৃদয়-তটে আসিয়া প্রতিহত হইবে—তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ সাংস্কৃতিক জগৎ ভৌগোলিক সীমাদ্বারা বিভক্ত নহে। কিন্তু হিন্দুসংস্কৃতির প্রভাববশতঃ বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলের নারীসমাজ সেই আনন্দ তাহার উপজাতীয় প্রতি-বেশিনীদের মত করিয়া প্রকাশ করিতে পারে। একদিকে বহিরাগত নবলব্ধ হিন্দু সংস্কৃতি ও অন্যদিকে প্রতিবেশী অনার্য সংস্কৃতি এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া এই অঞ্চলের কুমারীগণ ইহার যে অভিনব রূপের কল্পনা করিয়াছে—তাহাই ভাদুপূজা নামে পরিচিত হইয়াছে।"

ভাদুগানের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু গল্পও প্রচলিত আছে। এখানে ভাদুকে পঞ্চকোটের রাজকন্যা হিসাহে স্বীকার করা হয়েছে।

ভাদ্রমাসে এই রাজকন্যার জন্ম—তাই নাম ভাদু। ছেলেবেলা হতেই এই মেয়ের ঠাকুর-দেবতার প্রতি খুব অনুরাগ। রাজার মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের এক যুগলমূর্তি ছিল। রাজকন্যার ভগবৎপ্রেমের কথা কেউ জানতো না। তার বিয়ের সম্বন্ধ আসে কিন্তু রাজকন্যা কিছুতেই রাজী হয় না। রাজা মেয়ের এই আচরণে বিস্মিত হলেন। অনেকেই সন্দেহ করলো মেয়ে নিশ্চয়ই কাউকে

ভালবাসে। তাই বিয়ের কথা শুনলেই কান্নাকাটি করে, বিরক্ত হয়, এমনকি খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করে দেয়। মেয়ের উপর নজর রাখা হোল। দেখা গেল, মেয়ে প্রতিদিন রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। একদিন গভীর রাত্রে রাজা নিজে মেয়েকে অনুসরণ করলেন রাজমন্দির পর্য্যন্ত। সেখানে দেখেন মন্দিরের দরজা খোলা। ভিতরে প্রদীপ জ্বলছে। মেয়ে সেই মন্দিরে প্রবেশ করলো। তারপরই মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি শুনতে পেলেন যে তার মেয়ে ভিতরে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। হাসাহাসি করছে, মনের আনন্দে নাচগান করছে। রাজা ভাবলেন, পুরোহিতের সাথে বুঝি অবৈধ প্রেম চলছে। দরজা ভাঙ্গার আদেশ দিলেন। দরজা ভাঙ্গা হলে দেখলেন দেব বিগ্রহের সামনে মেয়ের বিগতপ্রাণা দেহ। বিগ্রহের পাশেই প্রতিষ্ঠিত হলো ভাদুর মূর্তি। সেই থেকে ভাদুপূজা ও ভাদুর নাচগানের প্রচলন হলো দেশে।

অনেকে বলেন—দেবী পার্বতী একবার মহাদেবের সঙ্গে ঝগড়া করে স্বর্গধাম ত্যাগ করেন ও পঞ্চকোটের রাজকন্যারূপে মর্ত্যধামে জন্ম নেন। রাজকন্যা ক্রমে ক্রমে বয়োঃপ্রাপ্তা হন, বিবাহযোগ্যা হন। কিন্তু রাজার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও বিবাহে রাজী করানো যায় না। এমন সময় দেবর্ষি নারদ এসে রাজাকে রাজকন্যার সত্য পরিচয় জ্ঞাপন করেন। অভিমানিনী পার্বতীকে মহাদেবের দুঃখকষ্টের কথা বলে স্বর্গধামে ফিরিয়ে নিয়ে যান। রাজা প্রাণাধিক এই কন্যার বিদায়ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েন এবং দেশে দেশে কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ ভাদুপূজার প্রচলন করেন।

এর উৎপত্তি সম্পর্কে আধুনিককালে একটি কিংবদন্তী শোনা যায়। আনুমানিক ১৮১৩ খ্রীঃ মানভূম জেলার পঞ্চকোটের রাজধানী কাশীপুরে নীলমণি সিংহ দেবশর্মা নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। ভদ্রেশ্বরী নামে তাঁর এক সুন্দরী কন্যা ছিল। বাউরী ও অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি তাঁর মমতা ছিল। বয়স বেড়ে চললো, কিন্তু বিয়ের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। রাজপ্রাসাদের মধ্যে এই অনূঢ়া রাজকন্যার মৃত্যু হল। কেউ বলেন—রাজা এই কন্যাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন তাই কন্যার অকাল মৃত্যুর পর প্রচার করলেন তাঁর কন্যার স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রতি গ্রামে ভাদ্র মাসে উৎসব পালন করতে হবে। কেউ বলেন—কাশীপুরের বাউরী ও অন্যান্য উপেক্ষিত সম্প্রদায় রাজকন্যার স্মৃতিরক্ষায় আগ্রহপ্রকাশ করে এই পূজার প্রচলন করে।

পূর্বপশ্চিম মানভূম, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূম—এই অঞ্চল জুড়েই ভাদুগানের অধিক প্রচলন। বাউরী ও অন্যান্য অন্ত্যজ শ্রেণীর

মধ্যে এই উৎসব বহুল প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রপূজা, 'করম্' পরব, জাঁতো পূজা ও এই ভাদু পূজা সবগুলিই অনুষ্ঠিত হয় বর্ষাঋতুর 'ভরা ভাদরে'। তাই একের প্রভাব অন্যে এসে পড়েছে।

পরবর্ত্তীকালে এই উৎসব মানভূম হতে বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্দ্ধমানে প্রসার লাভ করে। পঞ্চকোটের রাজ-কাহিনীর সাথে ভাদুপূজার যোগাযোগ লক্ষ্য করা গেলেও এই উৎসবের প্রচলন যে বাঙলাদেশে বহুপূর্ব্বেই ছিল তা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। ভাদ্রমাসের প্রথমদিনে গান গেয়ে এই উৎসব সুরু—

ভাদু নামলো দেশে
মুছাইব রাঙা চরণ মাথার কেশে
ভাদুমণি মা জননী গো সলতে ধূমো আলাতে[২৫]
জলতে জলতে নিবে গেল
ভাদুমায়ের বাঙলাতে[২৬]

সারা ভাদ্র মাসের প্রতি সন্ধ্যায় কুমারী মেয়েরা ভাদু গান গায়। ভাদু সম্পর্কে যে জনশ্রুতি তাতে দেখা যায় ভাদু কুমারী অবস্থায় মারা গেছে। তাই ভাদুর অধিকাংশ গানই বিবাহ সম্পর্কিত। যেমন—

ভাদুর আমার বিয়ে দোব ইষ্টিশনের বাবুকে
আসত্তে যেতে ভাল হবে যাবে রেলের গাড়িতে
আমার ভাদু মান করেছে মান ভাঙবার কে আছে?
যাদের ঘরকে আনলাম ভাদু তারাই তো মান ভাঙাবে।
বর্দ্ধমানের বণ্ডিল স্থতো চালে চালে লাগাবো
রায়পুরের ঐ ছোকরাদিকে তানমানে নাচাবো।
ঘরের ধারে পেঁপে গাছটি ঝাড়ি ঝাড়ি জল দিও
একটি পেঁপে পাকলে পরে তারে ঘরে পাঠাইও।

অথবা

ওগো ভাদুর বিয়ে দিতে বর মিলে না এ জগতে
হাজার টাকা নিলে কাকা ওগো বিয়ে দিতে বুড়ো বর দেখে
ইচ্ছে হয় না—সরম লাগে বুড়োর পাতে ভাত খেতে

২৫। প্রদীপের আলোয়
২৬। বৈঠকখানায়

ওগো ভাদুর ছোট ছেলে বেড়াছে ওগো বিলে বিলে
সরুর চিলে ছোঁ মেরেছে
যেরুন পুঁটি মাছ বলে
ওগো ভাদুর......এ জগতে।

গ্রাম্য মেয়ের পক্ষে রেলগাড়ীতে চড়া এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। গ্রামের চৌহদ্দির বাইরে যাওয়ার অধিকার বা প্রয়োজন যার নেই সে যদি রেলগাড়ীর কথা শোনে তবে পুলকিত হবে বৈকি! কিন্তু তথাপি অনেকেরই সারা জীবনে রেলগাড়ীতে চড়া হয়ে উঠে না। কুমারীমনের আশা, স্বপ্নাদির ছায়া পড়ে ভাদু গানে। তাদের অবচেতন মনে ট্রেনে চেপে বহির্জগতের সাথে পরিচিত হওয়ার যে সাধ তা পূর্ণ করে নিতে চায় মান-কুমারী বালিকা ভাদুর জীবনের মধ্যে। তারা শুনেছে শহরাঞ্চলে বৈদ্যুতিক তারের কথা যা দিয়ে সহজেই সংবাদ পাঠানো যায় দূরের যে কোন দেশে। পেঁপে পাকার অকিঞ্চিৎকর সংবাদও পৌঁছে দিতে হবে এই তারের মাধ্যমে। দ্বিতীয় গানটিতে অনূঢ়া কন্যার বিপদজনক পরিণতির এক করুণ সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

ভাদুকে কখনও দুরন্ত গ্রাম্য এক কিশোরী রূপে কল্পনা করা হয় আবার কখনও জননীরূপে। যখন ভাদু কিশোরী তখন গায়িকার দল স্নেহশীলা জননী-সুলভ অভিভাবিকার ভূমিক গ্রহণ করে। যেমন—

ভাদু চাপলো নতুন লাইনে চললো বাঁশি বাজিয়ে
কি কর—কি কর—ভাদু কদমতলায় দাঁড়িয়ে
কদমগাছে চাপলে ভাদু কষা কদম পেরো না
পাকলে পরে সবাই খাবে কেউ তো মানা করবে না।
কদমগাছে চাপালেন ভাদু শিরায় শিরায় পা দিয়ে
নামবার সময় দেখ ভাদু শিবের মাথায় ফুল দিও।
ভাদু নেমেছে দেশে।

'শিবের মাথায় ফুল' দেওয়ার মানে কুমারী হৃদয়ের পতি কামনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। ভাদুকে মনের মত করে সাজাতে চায় কুমারীর দল। তাদের অন্তরের যে অপূরিত সাধ—যা অবদমিত অবস্থায় গুমরে মরছে তাকে সফল করতে চায় ভাদুর মাধ্যমে। ভাদু তাদেরই ঘরের মেয়ে, তাদের সাধ্যে যা কুলায় তাই দিয়ে সাজিয়ে দেবে। ভাদুর কোন সাধ যেন অপূর্ণ না থাকে। তাই গান গায়—

ভাদু তোরে ভালবাসিয়া, ফুলে রাখিয়া

ফুলে ফুলে বেড়িয়ে এলাম কোন ফুল দোব চরণে
আমার ভাদু ছোট ছেলে গো কাপড় পড়তে জানে না।
ভাল করে পরাও কাপড় পয়সা দেব দু-আনা ॥
এ ভাদুটি কে গড়েছে গো—হাতে দেয়নি তার বালা
ফাঁকি দিয়ে পয়সা নিলে গো মানুকে বাগদী মুখপোড়া ॥

অথবা

তোমরা দেখে যাও ভাদুর কানপাশা
হাওয়াতে দোলে না পাশা, ভাদুর মনে বড় আশা।
কাল পূজেছি শতদলে আজ কেন গো নীলবরণ
আমার ভাদু মান করেছে কি দিয়ে মান ভাঙাবো
অন্ধকারে প্রদীপ জেলে জোড় হাত করে দাঁড়াবো।
ভাদ্রমাসে আনলাম ভাদু মাঠে হল জলটা
মাঠের মুনিষ খেটে খেটে হয়ে গেল রাতকানা।

দ্বিতীয় গানে ভাদুর অভিমানিনী রূপ ধরা পড়েছে। বর্ষা উৎসবের স্বাক্ষর এই গানে। ভাদু আসার পর মাঠ জলে ভরে গেছে। চাষী মনের আনন্দে চাষে মেতে উঠেছে। আবার শোনা যায়—

বর্দ্ধমানে দেখে এলাম গো মাঝের কাঁটার মাকুড়ী
কোন মাকুড়ী নেবে বল খোল গলার মাদুলী

অথবা

জবা বিল্বদলে দলে মালা গাঁথা দাও ভাদুর গলে
মালা মালা করছে ভাদু গো
তোমার কোন মালাতে সাধ আছে
এমন মালা গেঁথে দেব যাতে রাধাকৃষ্ণের নাম আছে
কাপড় কাপড় করছো ভাদু গো কোন কাপড়ে সাধ আছে
এমন কাপড় এনে দেব যাতে চিক্ বসানো পাড় আছে।

'রাধাকৃষ্ণের নাম' দেওয়া মালাই সর্বোৎকৃষ্ট। বিশেষত বৈষ্ণবদের কাছে। ওরা তাই দেবে ভাদুকে। রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনের মানবিক রূপটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ কুমারীমন বেরিয়ে আসতে চায়, দেখতে চায় আশে-পাশের জগৎটাকে, বাইরে যাবার সাধ ব্যক্ত করে বিভিন্ন গানে—

চল ভাদু চল খেলতে যাবো রাণীগঞ্জে বেলতলা
আসবার সময় দেখিয়ে আনবো কয়লা খাদের জল তোলা
রাণীগঞ্জের লোকে বলে—এটি তোমার কে বটে ?
লাজসরমে বলতে হল—বটঠাকুরের ভাই বটে।
ভাদ্রমাসে আনলাম ভাদু চন্দন কাঠের চৌদলে
ভাদু যদি করেন কৃপা—রাখবো সোনার মন্দিরে।

অথবা

ভাদু চল বেড়াতে—ক্যানেল কাটা দেখিতে
পদ্মপুকুর টলমল, জাম গাঁয়ের লোক পালাইল
ভাগ্যে ছিল বড়দাদা—সাহেব নিয়ে পাঠাইল
ও রাম তুমি যেও না বনে রামের মা বাঁচিবে কেমনে।
রাম ছেড়েছে যজ্ঞের ঘোড়া গো—অশোক বনের কাননে
আবার তাইতে ছিল লবকুশ—ধরে ঘোড়া আনাইল রে।
জয়দেব কেঁদুলী যাবো—রামের বিয়ে দেখিতে
সীতা সঙ্গে বিয়ে—অশোক বনের কাননে গো
ও রাম তুমি যেও না বনে।

দ্বিতীয় গানটির শেষ কয়টি লাইনে সঙ্গতি নাই কিন্তু এখানেও রামায়ণের প্রচ্ছন্ন প্রভাব। সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করেও ভাদু সঙ্গীতের প্রচলন দেখা যায়। যেমন—

॥ ১ ॥

ভাদুর ভাবনা কিসে ধান ভানা কল এসেছে দেশে
মালডিহের ঐ অক্ষয় মোড়ল ধানের মেসিন এনেছে
কোমরপুরের পূবধারে গো প্যাটেলনগর বসেছে
তারে তারে তার জুগিয়ে বিজলী বাতি জ্বেলেছে।

॥ ২ ॥

আসছে ক্যানেল মুসানজোর হতে মুনিষের দাম পাঁচসিকে
হল ক্যানেল ভালই হল জমিতে ধান মরবে না।
পাবলিকরা সব ভেবে বলে—কর জোগাইতে পারলে না
ক্যানেল এল এঁকা বেঁকা মধ্যেতে তার দেয় শাখা
ধারে ধারে মগরা দিয়ে মাঠেতে জল ফেলাইল।

॥ ৩ ॥

একটাকার চাল কিনতে গেলাম
দু-পাই বৈ আর পেলাম না
কন্ট্রোলের গম খেয়ে খেয়ে ভাবনাতে ঘুম হচ্ছে না
এ বছরকার বর্ষা কেমন পায়ে কাদা লাগলো না
যে দেশেতে নাইকো ক্যানেল—ভাবনাতে ঘুম হচ্ছে না *

॥ ৪ ॥

এবার হিসাব বুঝা দায় হলো নয়া পয়সা উঠিল
পঁচিশ পয়সায় চার আনা হয় তাইতো গরমেণ্ট বুঝাইল
একশো পয়সায় এক টাকা হয় তাইতো গরমেণ্ট জানাইল।
... ...
মেয়েছেলে দোকানে গেলে দোকানী মজা লুটিল।

এই ভাদু বা বোলান গানে মাঝে মাঝে গ্রাম্যতা বা অশ্লীলতা দোষ থাকে। যেমন—

ও ঠাকুরপো—চোখের মাথা খাও
দেখতে পাও না কি
আমার চোখের ইসারা ?

ঘেঁটু

পশ্চিমবাংলায় প্রধানতঃ বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলায় এবং হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগণা জেলার কোন কোন অঞ্চলে ঘেঁটু পূজা উপলক্ষ্যে লোকসঙ্গীতের প্রচলন আছে। চৈত্র মাসের চতুর্দশীতে কাঠের মূর্তি গড়ে এই পূজা হয়। পূজার কয়েকদিন পূর্ব হ'তেই অন্ত্যজ শ্রেণীর ছোট ছোট ছেলেরা গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ঘুরে এই পূজার চাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে। ঘেঁটু খোসপাঁচড়ার দেবতা—তাই তাঁর রূপটি কুৎসিৎ। রূপ বর্ণনা করে একটি গানের উল্লেখ করা হল :—

সাধের মালা রইল গাঁথা বরণ ডালাতে।
ঘেঁটুর রূপ দেখে আজ বিরূপ হ'লাম আমরা সবেতে ॥
আ মরি কি রূপের গঠন, (দেখে) গা-টা করছে কেমন।
গলা সরু মাজা মোটা টাক ধরেছে মাথাতে ॥

---

* খড়িয়া গ্রামস্থ অনাথ মাহারার কাছে সংগৃহীত।

কম হ'য়েছে চোখের জ্যোতি গোল হ'য়েছে বুকের ছাতি।
দাঁতগুলো সব নড়েছে আর চুল নেই চোখের ভুরুতে॥

ঘেঁটু মূর্তিতে তেল সিঁদুর মাখিয়ে গৃহস্থের বাড়ী নিয়ে গিয়ে উদ্যোক্তারা গান ধরে—

ঘেঁটু আয় দোরে। খোস বালাই নিয়ে যা দূরে॥
ঘেঁটু আয় দৌড়ি। হাতির কাঁধে চড়ি॥
হাতিরে গুড়গুড়ি বাজে। তা শুনতে ফলুই নাচে॥
ফলুরে জিও কান্দি। রাম লক্ষ্মণ মন থোক বাঁন্দি॥
থোক্ থোক্ তিন থোক। চিলে নিলে এক থোক্॥
ওরে চিল নড়্চড়্। দাঁড় করা পটুঙ্গাসুতো॥
মাছ মেরেছি ঈষের শুঁতো। হ'য়ে ছোঁড়া প্রকাণ্ড॥
ঈষ লাঙ্গল বার ক'র। এ হাল কোথাকে যায়॥
রসুনহাটাকে যায়। রসুনহাটায় কি কি বিকায়॥
মার মার খাণ্ডার বিকায়। এই খাণ্ডার লোব।
ভাসুর বন্ধক দোব। ভাসুর ভাসুর ভুনিয়া॥
কড়ি আন গা গুণিয়া। কড়া আনতে কড়ি ছোটে।
রাজার ঘরে লেঠু উঠে। নেই কি? দেয় কি?
কড়াই ছুটিয়া ভাই। এই যায় ওই যায়॥
ধোপার ঘাটে জল খায়। ধোপার ঘাটে জল খেয়ে॥
মোষ পড়লো ডুরুম দিয়ে। ঘেঁটু……যা দূরে॥

ঘেঁটুর গান ছড়াধর্মী। বোধহয় ছোটদের কথা স্মরণ করেই এ গানের সৃষ্টি। ভাবের কোন গভীরতা নেই। সুরও সহজ। গান রচনার পদ্ধতিই গায়কদের তাল বজায় রাখতে সহায়তা করে। নীচের গানটি শুনলেই তা বোঝা যাবে—

পিথম পিথম এলাম। ঘর গিরস্থর বাড়ী॥
গিরস্থেরা রেঁধেছে। শাগনের খাড়ি॥
শাগন গেল আগ্নে দিকে। চোর পালালো গলি দিকে॥
চোর লয় জোয়া কাঁন্দর। পলুই নাচে সাত সমুদ্দুর॥
পলুই-এর ভিতর মাছ মারি। মাছ মেরে খারুই-এ ভরি॥
খারুই-এ ভরে স্বর্গে উঠি। স্বর্গে উঠে রাজ করি॥
রাজে রাজে জোড়ালাম। চন্দন কাঠ চিলালাম॥

চন্দন কাঠের আগে কোরা। বার করবো ছিরা মিরা ॥
ছিরা মিরা কদ্দূর যায়। লালমোল ভেজে খায় ॥
লালমোলের টামটুমি। বুড়ি আনলে গামগুমি ॥
গামগুমিয়ে ভাঙ্গলে দাঁত। বুড়ি আনলে চৈত মাস ॥
চৈত মাসে চতুর্দ্দশী। বুড়ির কপালে চন্দন ঘষি ॥
চন্দন ঘষে পড়লো টোপা। এই বুড়ি তোর সাত বেটা ॥

সহরাই (বাঁধনা)

উত্তর-রাঢ়ের এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সাঁওতাল ও অন্যান্য উপজাতিদের বাস। আজও এরা আর্য্যেতর সভ্যতার সুপ্রাচীন রূপটি বহন করে চলেছে। আজও এদের সামাজিক উৎসব ও পূজাপার্বণে অরণ্য আদিম নিকষ কালো রূপটি ফুটে ওঠে। উৎসবের দিনে সাঁওতাল পল্লী হতে ভেসে আসে মাদলের ধ্বনি। মহুয়ার নেশায় মাতাল পুরুষ মাদল বাজায়, তালে তালে নাচে রমণীর দল। এ যেন তাদের নিজস্ব এক জগৎ। কোথাও ছন্দ পতন নেই।

সাঁওতালদের ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে 'সহরাই' বা 'বাঁধনা' অন্যতম। এই পর্ব উপলক্ষ্যে 'টাবু' বা সামাজিক অনুশাসন কিছুটা শিথিল হয়। ২৫শে থেকে ৩০শে পৌষ এই উৎসব চলে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে প্রবাস থেকে সব সাঁওতাল নিজ নিজ গ্রামে ফিরে আসে। পূজায় মন্ত্র আছে, পুরোহিত আছে, কিন্তু উৎসবে এ সব গৌণ। নাচগানই উৎসবের মুখ্য অঙ্গ। প্রথম দিনের 'ভাঙ্গা পূজো'। ভগবানের নামে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের নাম 'সিনান'। প্রতিটি বাড়ি হতে একসের করে চাল ও একটি করে মোরগ বা মুরগি চাঁদা নেওয়া হয়। 'জাহিরথানে' বা শালগাছের তলায় পূজোর আয়োজন হয়। সকাল আটটা হতে প্রায় চার ঘণ্টা পূজো চলে। এই পূজা পরিচালনার পুরোহিত নির্বাচিত হয় গ্রামবাসীদের ভোটে। সকলে যাকে পুরোহিত নির্বাচিত করবে তিনিই পূজো করবেন, বংশগত কোন দাবি নেই। পুরোহিতকে সাধারণতঃ বাৎসরিক পাঁচ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এই পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাঁকে বাঁধনা, মানসিংহ ও সারন পূজা করতে হয়। পূজার উপকরণ—আতপ চাল এক সের, আতপ চালের গুঁড়ো এক সের, সিন্দুর ও মোরগ বা মুরগী। পূজার পর পুরোহিত মুরগী কাটবে ও মাংস রান্না হবে। তারপর পচাই পূজা হবে। পূজা শেষ হলে উপস্থিত পুরুষেরা সকলে সেই

মদ ভাগ করে খেয়ে মাদল ও নাগরা বাজিয়ে গান করতে করতে নিজ গ্রামে ফিরে যাবে। মেয়েরা পূজার প্রসাদ পাবে না। তাদের অবশ্য বাড়িতে যা ইচ্ছা খাওয়ায় বাধা নেই। সন্ধ্যায় মেয়েরাও পচাই খাবে। মাতাল মেয়েপুরুষের দল মাদলের তালে তালে নৃত্যগীত করবে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও এই নৃত্যগীতে অংশগ্রহণ করে। মাদল, বাঁশি আর নাগরা বাজায় পুরুষেরা, গান* গায় মেয়েরা—

আশ্বিনী যায়তে কার্তিকা আওয়াই গো।
কঁন্দাসাগে মুড়োরিয়া গাই আজ য়রে ॥
তুয়ে শিষে মাখাব তেলের সিন্দুর,
মাখাইত কুজুরিয়া তেল আজ য়রে।

অর্থাৎ, আশ্বিন গেছে, কার্তিক এল, সাঁওতালদের বাঁধনা পর্বও সুরু হ'ল। গোয়ালের গরু বাছুরের মাথায় তেল সিন্দুর দিতে হয় কিন্তু গরু বাছুর সরষের তেল ও সিন্দুর লাগাতে অনিচ্ছুক। গরুগুলো অনুরোধ করছে—বনে কচুরী নামে যে ফল আছে—তার তেল মাখাতে হবে।

আবার নৃত্য। আবার গান—

গাই মা চরায় বাবু শ্রীবৃন্দাবনে হো
মহিষিণী চরায় গাঁগা পার আজ য়রে
গাই মা আওয়াই বাবু বেলা মা ডুবি গেল
মহিষিণী আওয়াই, আধা রাত আজ হে।

অর্থাৎ আদিম বাসিন্দাগণ গরু চরাতো আর অপর পারে মহিষ চরাতো। আজ বাঁধনা পর্ব। বৃন্দাবন হতে গরু ফিরে আসতে সূর্য ডুবে যাচ্ছে—মহিষদের ফিরতে প্রায় মধ্যরাত্র।

দ্বিতীয় দিনে 'গোয়াল পূজো'। সকাল প্রায় আটটায় প্রত্যেক অধিবাসী নিজ নিজ বাড়িতে একঘণ্টা ধরে পূজা করে। পূজার উপকরণ প্রথম দিনের মতই। মুরগী বলিদানের পর সেই মুরগীর মাংস ও মদ খেয়ে সারা দিনরাত শুধু নাচ আর গান। এইদিন যে গান হয় তার একটি উদাহরণ—

হোলা দলে উসিনা তল মাদল পুকুরিরে
তিহিন দলে বুঙা না দারা হারা
বাঙলা ওড়ারে।

*গানগুলি হেবড়াপাহাড়ীর সিদু হাসদার নিকট থেকে সংগৃহীত।

অর্থাৎ, বাঁধা পুকুরে স্নান করলাম। কাল বাঙলা ঘরে গোয়াল পুজো করবো।

তৃতীয় দিনে 'গরু খোঁটা' পূজা। সকালে বাড়ি বাড়ি সকলে নাচগান করবে। বিকালে বাড়ির প্রবেশ মুখে দরজার কাছে বাঁশের বা কাঠের দুটি শক্ত খুঁটি পোতা হয়। সেই খুঁটিকে কেন্দ্র করে চারধার গোবর জল দিয়ে ধুয়ে আলপনা দেওয়া হয়। আতপ চালের গুঁড়ো দিয়ে গোরু মহিষের শিং-এ ও কপালে তেল সিঁদুর মাখিয়ে কয়েকটি চালের পিঠে কপালে ঝুলিয়ে শিং-এ বেঁধে রাখা হয়। নাগরা আর লাঠি হাতে পুরুষের দল পাড়ায় পাড়ায় গান গাইবে, নাচবে, আর আনন্দ করে সেই পিঠে ছিঁড়ে খাবে। সারা রাত নাচগান চলে। নেশার উন্মাদনায় গেয়ে উঠে—

গৈহ য়েমে ঘুণ্টেরিয়া
দাদা ইয়া কাড়া য়েম ঘুণ্টেরিয়া
দাদা ইয়া দিলেম পিড়া দারা কোকানা।

অর্থাৎ, দুনিয়ার লোক দেখবে গোরু খুঁটো দিবি-না কাঁড়া (মহিষ) খুঁটো দিবি।

চতুর্থ দিন কোন পূজা নেই। শুধু গ্রাম প্রদক্ষিণ করে নাচগান। প্রতি বাড়ী হতে ৪ পাই করে ধান সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত ধান কোন বাড়িতে জমা রাখা হয় ও মানসিংহ পূজার সময় ঐ ধানের চাল গ্রামবাসীগণ সমবেত অনুষ্ঠানে রান্না করে খায়।

পঞ্চম দিন পুকুর হ'তে মাছ ধরে এনে নিজে নিজের বাড়িতে রান্না করে খায়।

ষষ্ঠ দিনে বনঝাড়া বা শিকার। ভোর পাঁচটায় গ্রামের পুরুষেরা নাগরা, তীর-ধনুক, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে বনে জঙ্গলে শিকারে বেরিয়ে যায়। শিকারসহ বিকালে সকলেই ফিরে আসে। শিকারে যা জীবজন্তু পাওয়া যায়—তা কাটার পর সকলকে সমান ভাগ করে দেওয়া হয়। গ্রামের প্রধানের কাছে তৈরি একটিমাত্র চালের পিঠে থাকে। সেই পিঠেটিকে গ্রামের প্রান্তে একটি বাঁশের খুঁটির মাথায় রাখা হয়। তারপর প্রথমে পুরোহিত ও পরে একজন একজন করে গ্রামবাসী সেই পিঠে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়ে। যার তীরে সেই পিঠে পড়ে যায় তারই জয়। সেই বিজয়ীকে কাঁধে নিয়ে সকলে আনন্দ করে। সে মেয়েদের ছাড়া সকলকেই প্রণাম করে। লাঠি নাগরা নিয়ে খেলা হয়। গ্রামের ভেতরে এসে প্রধান সকলকে মুড়ি, চিড়ে পচাই খাওয়ায়। তারপর প্রতি বাড়ীতে আবার নাচগান শুরু হয়—

অহায় পুরুব ঘনচোং অহাপোছিম ঘনচোং
অহায় হয় মা লেকাতে অহায় বাসদো সেটের এন্।

অর্থাৎ, বাঁধনা পর্ব পূর্ব কি পশ্চিম দিক হ'তে আসে—কেউ অনুমান করতে পারে না। এই পর্ব পূর্ব বা পশ্চিম দিক হ'তে না এসে সকল দিকে মধ্য হ'তে এসে উপস্থিত হয়েছে।

এঁগা আপুং আতোরে তুমদা টামাক্ সাডে কানা বাবা গো
অনা আঁঞম জিউডী লোঃ কানা
ইগাং বাডে তাঁহেন খান-গেল খজে খজেং আঃ
বারেং বাড়ে তাহে কান গেল বার ক্রোশ বানিজ আগুয়া।

বাপের বাড়ীতে বাঁধনা পর্ব চলছে আর শ্বশুর বাড়ীতে অশ্রু ভারাক্রান্ত কন্যা বলছে: আমার যদি নিজের ভাই থাকতো—তাহলে এই পর্ব উপলক্ষ্যে নিশ্চয় সে আমাকে নিমন্ত্রণ করতো। আমাকে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠাত কিন্তু হায়, আমার তেমন কোন আত্মীয় নেই।

লোক সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে কৃষি ও পশুপালন নির্ভরতা অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করেছে। কৃষিকার্য্যের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ডাঙ্গা, গরু ও গোয়াল, তাই পূজ্য দেবতা হিসাবে এদেরকেও গ্রহণ করা হয়েছে। আদিম সমাজের অন্যতম প্রথা পশুশিকারও উৎসবের আঙ্গিনা থেকে বাদ পড়েনি। এই শিকার চলে যৌথভাবে। শিকারলব্ধ বস্তু বন্টিত হয় সকলের মাঝে সমানভাবে। আজও কৃতী শিকারীর সম্মান দেওয়া হয় আদিম প্রক্রিয়ায়।

আদিবাসী সাঁওতালদের জীবনে পৌষের এই একটি সপ্তাহ সারা বছরের অমূল্য সম্পদ। সবরকমের গতানুগতিকতার হাত হ'তে মুক্তি পায় দুরন্ত এই সমাজজীবন। কোন টাবুর তর্জনী সঙ্কেত নেই। বিচিত্র সঙ্গীতের সুর ভেসে আসে গ্রামের এপ্রান্ত হ'তে ও প্রান্ত, বাঁধনহারা মাতালমন শুধু গাইতে থাকে।

অন্যান্য পর্ব ও সঙ্গীত

'সহরাহ' বা বাঁধনা সাঁওতালদের শ্রেষ্ঠ পর্ব। এছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে তাদের যে পূজার্চনা চলে তার প্রতিটির সাথেও জড়িয়ে আছে নাচ আর গান। আষাঢ় মাসে হয় বোঙ্গা পূজা। এই উপলক্ষ্যে যে গান গাওয়া হয়ে থাকে তার নমুনা—

তাঁহারি তা নাহনা তার না
তাঁহারি তা নানা হো
আগে তো বুহনালাং নিড়িয়ে গুন্দলি
তাঁহার পিছু বুহনালাং রাইমনি ধান

অথবা বনে কাঠ কাটলি নাঙ্গল বোনালি।
চাষ করবি কি ধান ফেলাবি।
এগুতে[২৭] ফিলাবো এডিরে গুন্দলি।
তার পিছু ফিলাবো রাইমনি ধান ॥
ছোলায় লো খামার ধান হ'লো বনে ঝাড়ে।
কামারে লোহা গলায় রে ॥

মাঘ মাসে যে মাঘি উৎসব হয় তার গান—

রাম কাঁন্দে বনে বনে লক্ষ্মণ কাঁন্দে গাঁয়ে।
রামলক্ষ্মণ গিলেই বানে বা লক্ষ্মণকে মারে গো
রামলক্ষ্মণ গিলেই বানে বা।

ফাগুন মাসে সারুল উৎসব। দোলপূর্ণিমার দুদিন পরে। তিনদিন ধরে চলে এই উৎসব। মাদলের তালে তালে সাঁওতাল পল্লী হ'তে গান ভেসে আসে—

চান্দ উঠে ঝিকি মিকি সুরুজ উঠে জ্বালা।
রাম বিন্দেরে মরা ঘরে আলা আন্দারে ॥
তেল নাই রে—বাতি নাই ; মরা ঘরে আলা আন্দারে।

'জাহির থানে' ঘর তৈরী করে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে গানই আচার গানই মন্ত্র।

তিহিং দ নাইকিং দ উকা ঘাট রে মুম কানা হো।
তোকা ঘাটে রে নাড়কা কানা হে।
তিহিং দ নাইকিং দ নিরাল ঘাটে রে উম্ কানা হো।
যত ঘটিয়ে নাড়কা বুহইলেন ॥

অর্থাৎ, আজকে স্নান করলাম, কালকে পূজা করবো। আবার—

তিহিংদ নাইকিং দ চিতিতে মু নিনাহ।
তিহিংদ নাইকিং দ চিতিতে নাড়কা য়েন ॥

২৭। আগে

তিহিংদ নাইকিং দ তোয়াতেস্থু নিনাহ।
তিহিংদ নাইকিং দ তাহিতে নাড়কা বুহই লিনাহ ॥

মানে, আজকে দুধে স্নান করলো, আবার দই-এ মাথা ধরলো।

বছরের শেষ হয় চৈত্রমাসের চড়ক উৎসবের মাঝে। এখানেও গান—

সাহার দিলাম গোবর দিলাম কি ধান পুঁত্‌লি।
কি ধান পুঁতে লালে লা।
মা বল্‌ হে রাইমনি ধান রে
বাব্‌হা বলে রৌলো ধান কেরি কান্দার ধান।

বিশেষ লক্ষণীয়, এই গানগুলোর অধিকাংশই আদিম শস্যকামনা ও কৃষিকার্য্যের বিবরণে সমৃদ্ধ। এই আদিবাসী সম্প্রদায় বাঙলা ভাষার সংমিশ্রণে একটি মিশ্রভাষা গড়ে তুলেছে, যাকে সাঁওতালী বাঙলা বলাই ভাল। অধিকাংশ সঙ্গীতেই সেই সাঁওতালী বাঙলার প্রয়োগ।

মনসা পূজার গান

উত্তর-রাঢ়ে এমন গ্রাম খুব কমই আছে যেখানে ধর্মরাজ বা মনসা পূজার প্রচলন নেই। অধিকাংশ মনসামঙ্গল রচয়িতাই নাকি রাঢ়ের অধিবাসী। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে এই অঞ্চলের কোথাও কোথাও বর্ধমানের আদিম সর্পদেবতা, জাগুলি ও বিষহরির পূজা মনসা পূজার রূপ নিয়েছিল বলে কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন। ধর্মঠাকুরের কামিন্যা ও মনসা যে একই দেবী সে সম্পর্কে বিদগ্ধ মহলে নানা রূপ মতবাদ প্রচলিত আছে। অধ্যাপক সুকুমার সেন মনে করেন—

'যে যে সূত্র ধরে ধর্মঠাকুরের মূলে পৌছই সেই সব সূত্রের কয়েকটি ধরে ধর্মঠাকুরের সঙ্গিনী কেতকা মনসার কাছেও পৌছই।

প্রথমতঃ কেতকা-মনসা ধর্মের অঙ্গজা, বেদের যমী যিনি ভগিনী হ'য়ে ভ্রাতাকে কামনা করেছিলেন পতিরূপে। কেতকাও ধর্মের কামিনী। (কামিন্যা)—

দ্বিতীয়তঃ কেতকা বারুণী। তাঁর প্রতীক জলভরা (আদিতে মদভরা?) ঘট, বেদের শ্বেত সোম কলস। তার থেকে নানা পথ বাঁক ঘুরে তিনি একদিকে হয়েছেন আরোগ্যের দেবতা বিষহরি, অপরদিকে শস্যদেবতা ইলা, শ্রী।

...মনসা পঞ্চমী দেবী, তাঁর পূজাতিথি হচ্ছে পঞ্চমী। ভগবতী ষষ্ঠী দেবী, তাঁর পূজাতিথি ষষ্ঠী। দেবী দুজনে মূলতঃ এক। তার প্রমাণ শীতল ষষ্ঠী।

এদিনে বাস্তুদেবতার পূজা। বাস্তু শিল্পে ছেলে-কোলে মনসা ও ষষ্ঠী দুই-ই পাওয়া যায়।

…ধর্ম যিনি ধারণ করেন তিনিই বাস্তুদেব। নাগ পৃথিবী ধারণ করে আছেন। সুতরাং নাগ হলেন বাস্তুদেব। নাগের থেকে এলেন মনসা। তার থেকে এখন সিজের (মনসা গাছের) ডালে পৌঁছেছে। উনোনে মনসা গাছের ডাল রেখে এখন বাস্তুপূজা করা হয়।'

অন্‌-আর্য্য সম্প্রদায় এই উৎসবের মূল উদ্যোক্তা। বগাপঞ্চমীর দিন অন্ত্যজ শ্রেণীর ভক্ত্যার দল মা মনসার 'বারি' নিয়ে আসে, ঘট প্রতিষ্ঠা করে, পূজার শুরু হয় মায়ের আবাহন দিয়ে—

মা-কে আনতে চল যাই ক্ষীর নদীর কূল
হাতে দেব হাতবালা, চরণে জবার ফুল।

আসরে মায়ের বন্দনা হয়। লৌকিক দেবী, তাই লৌকিক প্রথাতেই দেবীর প্রতিষ্ঠা।

থাম বন্ধম সভা বন্ধম
বন্ধম বসুমতী।
লাক্ক পাক্ক ঘাটে বন্ধম
দেবী সরস্বতী॥
গুণী ভেয়ের গুণী বন্ধম
নাটুয়ারই প্রাণ।
ছোট বড় গুণীনের
চরণে প্রণাম।
পদ্মবনে থাকেন মাগো
পদ্ম নাল কুমারী।
তোমার লাল পাদপদ্মে
লাল জবা দিব আমি॥
দুনিয়ারই অনাথিনী
না করিবেন হেলা।
আমার আসরে মা কমলা
তুমি কর খেলা॥

আমার আসর ছেড়ে মা গো
অন্য আসর যাও।
দোহাই আস্তিক মুনির
মাথা খাও॥

অথবা লোহা করে ঝিকিমিকি পাথরে না দেয় টান
বাদীর বান কেটে করি নানাস্থান
যে মুখে আলি বান সে মুখেই যা।
যদি বান ঘুরিস মোড়ে
ত্রিশূলধারীর দোহাই তোকে।
এ বন্ধন যদি নড়িস
ঈশ্বর মহাদেবের জট খ'সে পড়িস।
কার দোহাই, আমাদের কামিখ্যা মার দোহাই।

তারপর যৌথকণ্ঠে মায়ের বন্দনা সুরু হয়—

ভব বন্দনা করি বাঁকা শ্রীহরি
দয়া করো মা হস্তীদুয়ারী।
প্রথমে বন্দি করি শিবের নন্দন
তারপরে বন্দি করি আমি গণেশের চরণ।
পূবেতে বন্দি করি আমি গঙ্গা ভগীরথ
দক্ষিণে বন্দি করি ঠাকুর জগন্নাথ।
পশ্চিমে বন্দি করি আমি গয়া গদাধর
উত্তরে বন্দি করি আমি কামিখ্যার চরণ।
তারপরে বন্দি করি আমি মা মনসার চরণ।
তারপরে বন্দি করি আমি বেহুলা লখিন্দর।
তারপরে বন্দি করি আমি লোহার বাসরঘর।
কার দোহাই, মা মনসার দোহাই॥

উপবাসী 'ভক্ত্যার' দল সারারাত্রি গান করে—

লোহার আঁচিড় লোহার পাঁচির লোহার বাসর ঘর।
বাসরঘর বানালি কামার না রাখলি দুয়ার॥
বাসরঘরের ঈশানকোণে তুলা দিয়াছিল।
কালিনাগের নিঃশ্বাসে তুলা উড়ি গেল॥

টিকির প্রমাণ ছিল কালিনাগ সুতার সঞ্চার হ'ল।
সুতার সঞ্চার হ'য়ে কালিনাগ বাসরে সিঁধিল ।।
বাসরে সিঁধি কালিনাগ ভাবেন মনে মনে।
এমন সোনার বেনে দংশিব কেমনে ।।
ভাবিতে ভাবিতে কালিনাগ পাশতলে দাঁড়াল।
আশমোড়া পাশমোড়া দিয়ে কামড় হানিল ।।
চাঁদ সূর্য্য দুটি ভাই তোমরা থেক সাক্ষী।
গন্ধবেনের ছেলে হ'য়ে দণ্ডে মেল লাথি ।।
বেহুলা রাঁঢ়ী উচ্‌কপালী চিরোল চিরোল দাঁত।
বাসরে খোয়ালি স্বামী না পোহাল রাত ॥
আশি হাঁজার বেনে জাগে হাঁচাল লড়ি নিয়ে।
আসিবে মা মনসা নাগ—মারবো বাড়ি দিয়ে ॥

আবার—

পথ যেতে খেলি সাপা
তুই খেলি আশে, মুখ মুছিলি ঘষে
ডানে যেতে বাঁয়ে মারি, ঘের দরদর ঘেরে ঝাড়ি
সাপের নাম লীলা। যেখানে খেলি সাপা সেখানে বিষ মিলা ॥
কার দ'য়—মা মনসার দ'য়—
মা মনসার চরণ করি ধ্যান
বাজুক বিষম ঢাকি—চলুক ঝাঁপান।

বিয়ের গান

বাঙলার লোকসঙ্গীতের প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটেছে অন্দর মহলে ও অন্ত্যজ শ্রেণী মধ্যে। কৃষিব্যবস্থা মেয়েদেরই সৃষ্টি। উন্নততর ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্য মেয়েদেরই আয়ত্তাধীন ছিল। শস্য উৎপাদনে ছিল মেয়েদের প্রাথমিক অধিকার। তাছাড়া সন্তানকামনা। যে কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে যে আচার পদ্ধতি মেনে চলা হয় তা অন্দরমহলের নিজস্ব। মানুষের জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখদুঃখ, আনন্দবিরহের যে অনুষ্ঠান তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই মেয়েদের নিজস্ব আচার যুগাতীত কাল হতে চলে এসেছে। আদিম কৌমবদ্ধজীবনধারায় যে স্ত্রী-আচার প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবল পরাক্রম সত্ত্বেও তা আজও উচ্চ-

বর্ণের অন্দরমহল হতে মুছে দিতে পারে নি। লোকাচারের জগতে নিম্নবর্ণের রমণীর সাথে পল্লীর উচ্চবর্ণের রমণীর পরম একাত্মতা। হিন্দু নারীর সাথে মুসলমান নারীসমাজের অদৃশ্য যোগাযোগ। অতি বড় শাস্ত্রজ্ঞ ও বেদজ্ঞ পুরুষকেও এই অন্-আর্য্য রীতিসম্মত লৌকিক আচারকে মেনে নিতে হয়েছে। এই স্থলে বেদাচারের সাথে লোকাচারের সহাবস্থান।

বিবাহের লৌকিক আচার ও গীত মেয়েদের নিজস্ব। বিবাহের প্রস্তাবনা হতে শুরু করে শ্বশুরগৃহে কন্যার বিদায় পর্য্যন্ত বৈদিক মন্ত্রের সাথে চলে লৌকিক আচার সমান্তরালভাবে। কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে বিবাহের অনুষ্ঠানকে শাস্ত্রসম্মত রূপ দেয়। কিন্তু স্ত্রী-আচার ছাড়া কোন বিবাহই পূর্ণাঙ্গ নয়। বরবধূর মঙ্গল কামনা প্রভৃতি আচারের সাথে ভাবী জীবনের ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে। এদের অনুষ্ঠানে পুরুষের কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে। বর্ষীয়সী মহিলার দল কখনো রসাত্মক ছড়ায় কখনো বা বিবাহিত মেয়েদের সাথে প্রেমসঙ্গীতের মাঝে প্রভৃতি লৌকিক আচার এমন নিখুঁতভাবে সাঙ্গ করে যাতে কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যায় না।

বিবাহের এই অনুষ্ঠান যদিও একটি পরিবারকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে—তবু এর পরিধি পারিবারিক গণ্ডীর বাইরেও বিস্তৃত। বিবাহ একটি গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক অনুষ্ঠান। পঞ্চগ্রামের লোক মেতে ওঠে এক পরিবারের বিবাহকে কেন্দ্র করে। অন্ত্যজ শ্রেণী বা আদিবাসীর ক্ষেত্রে বিবাহ সেই গোষ্ঠীর যৌথ অনুষ্ঠান।

সাঁওতালদের বিবাহের রীতি ও গীতি সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে। বিবাহের ক্ষেত্রে বাউরী মেয়েদের তরজার মত পালা গান গাওয়ায় রীতি আছে।

ও মাসী মেসেনী'
ফুল বাগানে গো মাঝে তুলে নি
ও দোকানী দোকান খোল
ওর গাঁয়ে মিলন হবে তুর*

একপক্ষ বলে

খেল কদমে পাত কালো

---

*। গানটি শুকনা গ্রামের পূর্ণদাসী বাউরীর নিকট সংগৃহীত।

অন্যপক্ষ বলে আমি কালো গো

তু কত ভালো।

তার উত্তরে প্রথমপক্ষ জবাব দেয়:

খেল কদমে—তুলেতে তুলেতে তুলেতে।

প্রত্যুত্তর এল:

খেলবো না বেজের ধুলোকে।

ধাঙরদের বিবাহকালীন গানের একটি উদাহরণ—

ছোট বৌ পেরওয়া বড় বো পেরওয়া সামা—
দিক দিকে বাহসৈ জাতিরে কুটুম
বিগরে বাহসৈ সামা।
ছোট বৌ……সামা

বিশো কোশ গঙ্গা দশ কোশ যমুনা
যমুনাকে পার কর উধার দে দশ ভাই
গঙ্গাকে পার করে মু দারি দি
দশভাই না লাগিল সোনা না লাগিল রূপা
না ছাতি চাঁদোয়া যে লাগি।

'ঢেকাড়ো' নামে এক সম্প্রদায় আছে, যাদের পদবী কর্মকার তাদের যে বিবাহানুষ্ঠান—তাতে সঙ্গীত অপরিহার্য্য।

বাবা দুলালী গো বেটী আজ কেনে চন্দন মোহকে
বাঁহাতে কাঙ্গানা দোলাওএ
রায় রেসা তেলা[২৮] এসো বেটী
ভায় তু উ গোটা কুড়োপুতা
কাঙানা দোলাওএ
জিহদিনে বেটি গে তুহরো জনম
সেহ দিনে বেটি গে হামে সুবম গাল
বাঁজা মা বাহিনী বেটি হামে শুনম্ সাল
আঁচল পাতিয়ে বেটী হামে লিব গান*

২৮ হলুদ তেল

*। গানটি রাসপুরের বিজয় সর্দারের নিকট সংগৃহীত

অথবা

শশুরা কে বুলচাল কে শুনা
মায়ের নিজেকের বাপ যেমান তে শুনা
ভেসরেকা বুলচাল কে শুনা
মায়ের নিজেকের ভাই যেসান তে শুনা
মেহমান কে বুলচাল কে শুনা
মায়ের টাঙ্গাকা ধার যেমান তে শুনা

বিয়ের উৎসবে বাউরী মেয়েরা বিবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করে গান গায়, যার সাথে অনুষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নেই ও কোন ভাবগত ঐক্য নেই। কতকগুলি মেয়েপুরুষ মিলে পালাপালি করে এইগান গায়।

বাউরী সম্প্রদায়ের উৎসব গান ও নাচ ছাড়া কল্পনা করা যায় না। মেয়ে-পুরুষ সকলেই মেতে উঠে। কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল।

নতুন বর এসেছে—বরকে গাড়ী থেকে নামানোর সময় পাড়াপড়শী বর্ষীয়সী মহিলার দল রঙ্গ করে গান ধরে—

তোদের জামাই এলো ভাঙ্গা ফুটো
গাড়িতে গো গাড়িতে।
জল দোব না ভাল ঘটিতে ॥

কাজের বাড়ীতে সবাই ব্যস্ত। যত না কাজে ব্যস্ত—তার চেয়ে বেশী ব্যস্ততার লক্ষণ। এরই মাঝে কচি ছেলের মাও চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কিন্তু কোলে যে তার কচি ছেলে, করবে কি? দাঁড়িয়ে যে বিয়ে দেখছে—তাকেই অনুরোধ করে গানের মাঝে—

ছেলে ধর্ গো ঝাল বাঁটি
মুরগিটো কেটে করলাম কি।

বর বিয়ে করে নিয়ে এল নববধূকে নিজের বাড়ী। বুড়ী ঠাকুমা নাত্ বৌকে দেখে অবাক হওয়ার ভান করে। ওমা ছিঃ! একি বৌ এলো গো! রঙ্গচ্ছলে গান জুড়ে দিল—

তারা তারা আকাশেরই তারা
ও মাগীটো ভাল্ছে,[২৭] দেখ
যেন বেঙের পারা।

২৭। দেখছে।

তারপর নাতির লজ্জারাঙা মুখের পানে চেয়ে সকৌতুকে ইঙ্গিতপূর্ণ গান ধরলো—

যা খেলবি-তাই খেলা
হেরিকেনের ভেতর আলা।

ইঙ্গিতটি শুধু দ্বির্থকই নয়, কাব্যিকও।

মুসলমান সমাজেও স্ত্রী-আচার মেনে চলা হয়। এক্ষেত্রেও স্ত্রী-আচারের সাথে সঙ্গীত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সঙ্গীতগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে অপূর্ব।

॥ ১ ॥

কদমতলায় দাঁড়িয়ে বাগাল
তুমি কতই লীলা করহে।
আমার লেগে এনো হে বাগাল
এলিফুল আর বেলীফুল॥
ও তোর গরু গেল পালিয়ে
ও তোর ছাগল গেল পালিয়ে
আমি দুটো কথার গুণাগার।

'কদমতলা' আর 'বাগাল" রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাবুদের বাঙলাতে লাগাবো
ফুলেরই বাগান।
কন্যাকে দেখে লাগে চমৎকার।
কালো ভোমরা ওড়ে পালের পাল
ঝাঁকে ওড়ে রে
ঝাঁকে বসে রে
আমার সকল মধু খেয়েরে
ভোরে হল কালা দেশান্তর।

॥ ২ ॥

এক বাটাতে লঙ সুপারী জোড় বাটাতে পান রে
খেয়ে যারে নও সাবালা[৩০] জোড় বাটার পানরে॥
আগে আছে ননদিনী বড় লাগে লাজরে।

৩০। বর।

ছেড়ে দাও রে ছোট দেওরা নদীর ঘাটে যায় রে।
পানিয়া কো যায় গরীয়া[৩১] কাঁখে নাচে গাগরী রে ॥

॥ ৩ ॥

জামাই আসছে জামাই আসছে
গাছে পাকা আম—
জামায়ের লেগে রেখেছি বেটি
পূর্ণিমার চাঁদ
আলমতলায়[৩২] দাঁড়িয়ে জামাই
চাইছে জামা জোড়া দান
আলমতলায় দাঁড়িয়ে জামাই
চাইছে শ্বাশুরীকে দান
কি বললি গোলামের বেটা
মুখে রুমাল বাঁধ
জামায়ের লেগে রেখেছি বেটি
পূর্ণিমার চাঁদ ॥

॥ ৪ ॥

তিনটে মালতীর পাত তাতে দেব বড়া ভাত
কি বাণ মারিলি কালা জ্বলে গেলাম রে
কি বাণ মারিলি কালা অঙ্গে।
জ্বলাবাণ মারিলি কালা পোড়াবাণ মারিলি রে
তুমি ত' পরের পুত, তোমার লেগে এত দুখ
দেশান্তরি হবো তোমার সঙ্গে।

উপর্যুক্ত গানগুলিতেও রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। সুন্দরী নারীর গাগরী কাঁখে নদীর ঘাটে জল আনতে যাওয়ার সেই অতি পুরাতন দৃশ্য। তার পূর্বে জামাইকে পান খাওয়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। জামাইয়ের জন্য প্রতীক্ষমাণা যে মেয়ে—সে যেন পূর্ণিমার চাঁদ। শেষ গানেও সেই 'কালার' কাছে আত্মসমর্পণ। 'কালা'র প্রেমে অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। তাই তো মন মানে না। কালার জন্যে দেশত্যাগিনী হবে মেয়ে।

৩১। সুন্দরী।
৩২। ছাদনাতলা।

সাঁওতালদের বিবাহ ও গীত

সাঁওতালদের সামাজিক রীতিনীতি বিবাহ আচারানুষ্ঠান, বিচারপদ্ধতি বা শাস্তিদান স্বতন্ত্র ধরনের। সামাজিক শাসননীতির ক্ষেত্রে ওরা নিজস্ব আইনকানুন মেনে চলে। বিবাহের ক্ষেত্রেও সুনির্দ্দিষ্ট প্রথা মেনে চলা হয়। লোকসঙ্গীত আলোচনার ক্ষেত্রে বিবাহের রীতিনীতির বিশ্লেষণ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক, তবু যে সামাজিক পটভূমিকায় এই জাতীয় লোকসঙ্গীতের উদ্ভব সেই পটভূমিকা জানা না থাকলে সঙ্গীতকে সম্যক্ উপলব্ধি করতে অসুবিধা হতে পারে। তাই আলোচনা করা হল। প্রথমে পাত্র বিবাহযোগ্য হলে পাত্রের অভিভাবক ঘটক নিযুক্ত করেন। উপযুক্ত পাত্রী সন্ধান করার পর উভয়পক্ষের লোকজন একস্থানে মিলেমিশে পাত্রপাত্রী দেখে নেয়। উভয়পক্ষ রাজী হলে বিবাহের দিন স্থির হয়। পাত্রপক্ষ প্রথমে পাত্রীর আত্মীয় ও গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী হতে দু'জন করে লোক নিমন্ত্রণ করে। এই প্রথায় খরচ বেশী হয়। প্রথার নাম 'হরোঃ চিখ্‌না'। অধিকাংশের সামর্থ্য না থাকায় কেবলমাত্র গ্রামের মোটামুটি দু'চারজন ভদ্রলোক ও কন্যাপক্ষের কয়েকজন আত্মীয়স্বজন পাত্রগৃহে নিমন্ত্রিত হয়। 'হরোঃ চিখ্‌না' প্রথার মর্য্যাদা রাখতে একবিশ দশ আড়ি ধান দিতে হয়। পাত্রীপক্ষকে পণ দিতে হয়। বাঁধাপণ মাত্র ১২ টাকা। বিবাহের দিন স্থির হ'ল—পাকা সুতোয় গিঁট পড়লো। বিবাহের দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন গিঁট পড়বে। ঘটক সেই গিঁট দেওয়া সুতো ও দশপাই চাল নিয়ে পাত্রীর বাড়ী পৌঁছে দেবে। এই প্রথার নাম 'জামাইতিরি' ও 'বালাতিরি।'

বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিনে বরযাত্রীদের জন্য আবশ্যকমত চাল, ডাল, তরকারী ইত্যাদি সাথে নিয়ে পাত্রপক্ষ আসবেন। ঢাক, ঢোলের বাদ্যসহ বরযাত্রের দল পাত্রীর গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। প্রত্যেক গ্রামেই বিবাহ উপলক্ষ্যে সাহায্যের জন্য একজন 'জগ্‌মাঝি' থাকে। বরযাত্রী গ্রামে উপস্থিত হওয়া মাত্র জগমাঝি এক ঘটি জলসহ আশীর্বাদ গ্রহণের অনুষ্ঠানাদি করবেন। প্রথমে বরযাত্রীদল গ্রামের বাহিরে কোথাও কোন গাছতলায় বিশ্রাম করবেন। ঘটক পাত্রীপক্ষের বাড়ী গিয়ে পাত্রকে অভ্যর্থনা করার জন্য কলসীতে জল, থালা, বাটি, মাদুর ও গুড় নিয়ে এসে পাত্রকে আলিঙ্গন করবে। তারপর পাত্রপক্ষ পাত্রীর বাড়ীতে আসবে। এরপর বিবাহের অনুষ্ঠান। সিন্দুরদানের সময় তিনজন লোক একটি বড়ডালায় পাত্রীকে তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে আনবে, পাত্র একজন লোকের কাঁধে চেপে এসে পাত্রীর মাথায় কপালে সিন্দুরদান করবে। সিন্দুরদান হ'লেই বিবাহ সম্পূর্ণ

হয়ে গেল। গ্রামের জগমাঝি তখন বরযাত্রীদের পাত্রীগৃহে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসার ব্যবস্থা করে সাধ্যমত পচাই মদ ও মাংস খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করে দেবে।

পরদিন সকালে বরযাত্রীদের খাইয়ে বিদায় দেওয়া হয়। নববিবাহিতা বধূ ও পাত্রীর কিছু আত্মীয়স্বজনসহ বরযাত্রীর দল পাত্রপক্ষের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়।

তৃতীয় দিনে পাত্রীর সঙ্গে যারা এসেছে তারা পাত্রের কাছে একটি বলদ পাবে। এই প্রথার নাম 'বারে ইভেৎ'।

বিবাহের যে দিন ধার্য্য হয়—সেদিন সাঁওতালী মেয়েরা যৌথভাবে নাচ গান করে, পুরুষেরা বাজায় মাদল, নাগরা আর বাঁশি। এই গানকে বলে 'ছাটিয়ার গান'।

তোকোর মা রাচারে
হাঁড়ি গেলে দ
তোকোর মা বাটেরে
এঁড়বা গেলে দ
আমকা মা রাচারে
নিঁড়ি গেলে দ
আমকি মা বাটেরে
এঁড়বা গেলে দ
নিয়াল সঙ্গে সানাইয়া
নিঁড়ি গেলে দ
বাড়ে জঙ্গে সানাইয়া
এঁড়বা গেলে দ।

কার উঠোনে মেয়ের বিয়ে? কার উঠোনে ছেলের বিয়ে? অমুকের উঠোনে মেয়ের বিয়ে। অমুকের উঠোনে ছেলের বিয়ে। মেয়ের বিয়ে দেখবার ইচ্ছা। ছেলের বিয়ে দেখবার ইচ্ছা।

বর্ষীয়সী মহিলার দল গান গাইবে—

টুমু ডেং গে টুমু ডেং
মিরু টুমু ডেং হো।
হোনোরে অং গে হোনো রে অং
কারো হোনে রে অং

তিনকু টাকা সাদে দো
কারে হেনো রে অং
মোড়ে টাকা গনং দ
মিরু টুমু ডেং হো
দান কং মুরি সাদে দো
কারে হোনো রে অং

দা বাপলা সিরিং অর্থাৎ জল সওয়ার গান ঃ

তাঁহারে তা নানা তারে না
তাঁহারে তা না নানা হো
তা নানা তাহারে তা
না নানা হো
পখোরি গি পখোরি
তকই রেয়াং পখোরি
বান্দে লাই গি বান্দে লাই
তকই রেয়াং বাহা বান্দে লাই।

এই পুকুর কার? এই বাঁধ কার? এই পুকুর অমুক লোকের পুকুর এ বাঁধ অমুক লোকের বাঁধ।

পখোরে গি পখোরি
ফালনা রেয়াং পখোরি
বান্দে লাই গি বান্দে লাই
আমকি রেয়াং বাহা বান্দে লাই।

মাড়োয়ার গান— বিবাহের অনুষ্ঠান চলাকালীন এই গান গাওয়া হয়

তোকোর মা রাচারে দা বোম্বোক
দা বোম্বোক মানা চাউলি বুহুল
আমকা মা রাচারে দা বোম্বো ক
দা বোম্বোক মানা চাউলি বুহুল
তোকোর রহুই লে নিম দ
হিপিড় হিপিড় নিম দ
বিন্দ দারে দ
তোকোর যতন লে নিম দ।

হিপিড় হিপিড় নিম দ
নিম দারে দ।

কার উঠোনে জল দাঁড়িয়েছে। জল দাঁড়িয়ে চাল ভেসে গেল। অমুক লোকের উঠোনে জল দাঁড়িয়েছে। জল দাঁড়িয়ে চাল ভেসে গেল। কে পুঁতলো নিম গাছ? নিমের পাতা দুলছে। কে যত্ন করেছে এই নিমগাছ? নিমের পাতা দুলছে।

শুভদৃষ্টির গান :—

আতো গাতিকুড়ি কোড়া
মায়া জালাং ছাড়া কিদৈই
ইন্দ ডেজ কান বোঙ্গা দেউড়ে
ইং রেনাং মায়া জালা মিনা আনাং মেন থাং
কাদাম বাহা তে চাপা দিন পে
ত্রিয়ে ডুরিয়ে তে গেদু জিন্ পে
দেউড়ে চিতাং কুনি শহর মুর।

এই গ্রামের ছেলেমেয়ের সাথে মিলেমিশেছিলাম। আমি দেবতার ডালাতে চেপে এদের মায়া ছেড়ে দিলাম। আমার মায়াদয়া আছে—আমার কদম ফুলে বাঁশের ডুরি দিয়ে ইসারা করে ডাকিস ডালার উপর থেকে উপুড় হ'য়ে পড়ব।

বিদায়ের গান—

রাসিঁ আতো রেন কুড়ি কানাম
বে রনিঁ আতোরে পাড়া ওনা
রনি আতো নালম দিশেঁ গাঁতি দিয়া ছাড়াও মে
হড়ম আলম চিলে দায়াম এঁড়ে অ।

—বড় গ্রামের মেয়ে ছিলি, ছোটগ্রামে পড়লি। বড়গ্রামের কথা মনে রাখিস না। মেলামেশা ছেড়ে দে। শরীর খারাপ করিস না। শরীরে দয়া দেখাবি।

এদের বিবাহের 'জগমাঝি'ই আমাদের নাপিত। বিবাহের পাত্রপাত্রীর সন্ধান ও যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া আমাদের ঘটকের মুখ্য কাজ। এদের ক্ষেত্রে বিবাহের দিন পর্যন্ত ঘটকের প্রয়োজন হয়। জল সওয়া, সিন্দুরদান, শুভদৃষ্টি এই অনুষ্ঠানগুলি অন্-আর্য্য রীতির ঐতিহ্যানুসারী। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্দর-মহলের যৌথ আচারানুষ্ঠান ও নৃত্যগীতই মুখ্য অঙ্গ।

আলকাপ

উত্তররাঢ়ের গ্রামের অন্ত্যজ শ্রেণীর যেকোন সামাজিক বা ধর্মীয় উৎসবে লেটো বা আলকাপ বিশেষ জনপ্রিয়। তাই এই জনপদের মেলাখেলা আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে অনুষ্ঠানসূচীতে আলকাপ থাকবেই। সন্ধ্যা না হতেই ভীড় জমবে। আসরের ঠিক কাছাকাছি জায়গা পাওয়া চাই। অল্প শীতে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে জমাট হয়ে বসা। পায়ের কাছে হ্যারিকেনের আলো। মাঝে মাঝে বিড়ি ধরিয়ে নেওয়া। অবিশ্রান্ত পুলকে সারারাত আলকাপের গান ক্লান্তিহীন উপভোগ। গানের ভাষা সহজ সরল। ভাবের গভীরতা নেই। সুরে আধুনিকতার স্পর্শ। নৃত্যে মনোহারিণীর ছন্দ। আখ্যানে পরিহাসোচ্ছল মধুর দ্বৈত জীবন।

আলকাপ গান সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য লিখেছেন: 'গম্ভীরা গানে বিষয়গত বৈচিত্র্য যাহাই থাকুক না কেন—ইহাতে প্রধানতঃ শিব দেবতাটি লক্ষ্য থাকে বলিয়া এদেশে মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের সাথে ইহা কেবলমাত্র হিন্দু কৃষকসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। মুসলমান সমাজে ইহা কালক্রমে একটি স্বতন্ত্ররূপ লাভ করিল—তাহা আলকাপ বলিয়া পরিচিত।......আলকাপ গানে কোন ধর্ম্মীয় লক্ষ্য বলিয়া ইহার বিষয় নিতান্ত লঘু এবং রুচি ও নীতিবোধে সময় সময় অত্যন্ত নিম্নস্তরে গিয়া পৌঁছিয়া থাকে।......জীবনের কোন গভীর বিষয়ই আলকাপ গানের ভিতর দিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ গান ও ছড়াই সমসাময়িক নিতান্ত লঘুসুরের বিষয়বস্তু লইয়া রচিত হয়।......মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিষয় হইলেও বাঙলার লোক-সংগীতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ স্থানলাভ করিয়াছে বলিয়া আলকাপ গানেও রাধাকৃষ্ণের নাম শোনা যায়।'

উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজকে আলকাপ গান রচনায় ও পরিবেশনায় উৎসাহিত করেছে একথা স্বীকার করে নেওয়ায় অসুবিধা আছে। গম্ভীরা গানের উৎপত্তি ও প্রসার উত্তরবঙ্গেই। এ কথা সত্য যে উত্তর-রাঢ়ের গাজন ও বোলানগান গম্ভীরাধর্ম্মী। আলকাপ উত্তর-রাঢ়েই প্রসারলাভ করেছে বলে মনে হয়। গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ বর্ষ-বিবরণী আলোচনা। বৎসরের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীই গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। গাজনের গান প্রধানতঃ মহাদেবকে কেন্দ্র করে অধ্যাত্ম-সঙ্গীত। বোলান গানে মুখ্যতঃ রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা। কিন্তু আলকাপে আছে দাম্পত্যজীবনের সুখদুঃখ।

আনন্দবিরহ আর কৃত্রিম কলহের কথা। এবং সমসাময়িক ঘটনার প্রতিফলনও দেখা যায়। গম্ভীরা-গাজন-বোলান গানে লঘুরস বা হাস্যপরিহাসের স্থান গৌণ—অধ্যাত্মবাদ বা বৎসরের ঘটনাবলী গুরুত্বসহকারে পরিবেশিত হয়। গায়ক ও শ্রোতার মাঝে একটি ভক্তিভাব বিরাজ করে। কিন্তু আলকাপের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন দেবদেবীর সম্পর্ক না থাকায় কোন ভক্তিভাব নেই। বরং আদিরসাত্মক ছড়া বা নৃত্যগীতে অবচেতন মনে যৌনজীবন সম্পর্কিত নানা কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেম, হরপার্বতীর বিবাহ বা সংসারযাত্রার লৌকিক রূপ দিতে গিয়ে যে লঘু পরিহাস, যে অন্‌-আর্য্যসুলভ বর্ণনভঙ্গী—তাই কালে আলকাপে সংক্রামিত হয়েছে। আলকাপের স্থূল ও চটুল রসিকতা, বিকৃত যৌনরস ও দাম্পত্যজীবনের অসামাজিক দিক—ইত্যাদির কথা পর্য্যালোচনা করে এই গানকে গম্ভীরা গান—যে গান বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সময়ে শুধু উত্তরবঙ্গে সীমাবদ্ধ—তারই উত্তরাধিকার হিসেবে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভুম বা বর্দ্ধমানের মুসলমান সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে ডঃ ভট্টাচার্য্যের এই মন্তব্য মেনে নেওয়া যায় না। আলকাপ সম্পর্কে 'বাঙলার লোকনৃত্য' গ্রন্থে মণি বর্দ্ধন লিখেছেন: 'ভাষা ও প্রয়োগ কৌশল স্থূলধরণের কারণ শিল্পী ও পালা-রচয়িতারা অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। চাষী দিনমজুরেরাই শিল্পী।·· ···পালার প্রারম্ভে বন্দনা গান······তারপর চললো আখ্যান-সুরে সংলাপ পালাগানের।

······দর্শকবৃন্দ খুসী রাখতে, আসর জমাতে প্রথমেই সুরু হয় তাদের নৃত্য। যুবতীবেশে যুবক বুকে মেডেল ঝুলিয়ে এককভাবে, দ্বৈতভাবে কখনও বা যৌথভাবে নৃত্য করে। নৃত্য চলে বাইজীর মত—কটিদোলনের প্রাধান্য। বাইজীসুলভ গ্রীবাভঙ্গী। অক্ষিকর্ম্ম ও পাদকর্ম্মে পুষ্ট সে নৃত্য।'

গ্রামের অন্ত্যজ শ্রেণীর পরিবারে যে কিশোরের চেহারা নারীসুলভ ও কণ্ঠ গান গাওয়ার উপযোগী সাধারণতঃ তাকেই এই আলকাপ গানের কেন্দ্রবিন্দু বা 'ছোকরা' হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। সে কিশোরীর মত মাথায় দীর্ঘ কেশ রাখে। সুদীর্ঘকালের শিক্ষার ফলে বাইজীর মত নৃত্যগীত এদের আয়ত্তে আসে। চোখমুখের ইঙ্গিত, চালচলন সবই চপলা কিশোরীর মত। দলের সাথে বিভিন্ন পরিবেশে ও বিভিন্ন রুচির আসরে এরা নৃত্যগীত পরিবেশন করে। সহজাত ও অনুশীলনজাত বুদ্ধিবৃত্তির ফলে যে কোন প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। এইদিক থেকে এই গানের 'ছোকরা'র সাথে পূর্ববঙ্গের ঘাটু গানের 'ঘাটু'র সাদৃশ্য আছে। সেখানেও গ্রামের কোন চারুদর্শন, সুকণ্ঠ নিম্ন

সম্প্রদায়ের বালককেই নির্বাচন করা হয়। বালিকার মত দীর্ঘ কেশ। বার চৌদ্দ বৎসর বয়স হতেই এই বালক এককভাবে বা যৌথভাবে নৃত্যগীতের ব্যবসা করে। বালকের অভিভাবকই ঘাটুগানের সম্প্রদায়ের হাতে বালকটিকে তুলে দেয়। এর ভরণপোষণের সমস্ত দায়িত্ব এই সম্প্রদায়ের।

'আলকাপ'কে এদেশের লোকে সংক্ষেপে বলে 'কাপ্'। অনেকের ধারণা—'কাপ'কথাটি এসেছে সংস্কৃত 'কাপট্য' শব্দ হতে। 'কাপট্য' শব্দের অর্থ ব্যঙ্গ-রসাত্মক নাটক। আর আল্ অর্থে মৌমাছির হুল। অর্থাৎ 'আলকাপ' মানে দাঁড়ালো—এমনই এক ব্যঙ্গ-রসাত্মক নাটক যাতে হুল ফোটানোর জ্বালা আছে। কেউ অঙ্গভঙ্গী বা কণ্ঠস্বর বিকৃত করে ব্যঙ্গ বা হাস্যরস সৃষ্টি করার চেষ্টা করলে এ অঞ্চলের লোকে বলে—'নে-আর কাপ্ করতে হ'বেনা'—অথবা 'ঢ্যাখ্-ঢ্যাখ্-কাপ্ করছে।'

আলকাপ সাধারণতঃ গ্রামে ধান ওঠার পর শীতের সুরু হতে যে কোন ধর্মীয় উৎসবে বা মেলায় শোনা যায়। দলে মূল গায়েন, দোঁহার বাদক, নৃত্যশিল্পী ইত্যাদি নিয়ে দশ পনের জন থাকে। বাদ্যযন্ত্র থাকে—হারমোনিয়াম, জুড়ি, জং ও ডুগি তবলা। কোন বিশেষ নাটক এখানে অভিনীত হয় না। আসরের পরিবেশ বুঝে পালা জমে। দাম্পত্যজীবনের প্রেম ও কলহ, বিশ্বাস অবিশ্বাস এর একেকটি চিত্র এই গানের মধ্যে ফুটে ওঠে। ব্যঙ্গ চাতুর্যের খেলাও জমে ভাল। এরই মাঝে আধুনিক সভ্যতার সমালোচনা ও প্রশস্তি হয়। অধিকাংশক্ষেত্রেই পল্লীসমাজে নাগরিক জীবনের কুফল, ব্যর্থ অনুকরণপ্রিয়তা, আধুনিক নারীসমাজের প্রগতি ইত্যাদিকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গগীতি গীত হয়। প্রথমে মূল গায়েন আসর বন্দনা করে—

কোথায় গো মা বীণাপাণি
শ্বেতম্বর জবাসিনী
অজ্ঞান নাশিনী
জ্ঞান দাও মা আমারে।
পড়িয়ে কাতর—ডাকি করজোড়ে
এসো মা আসরে—ব'স কণ্ঠভ'রে
কে জানে মা তোর মহিমা?
বস্‌তে আমি আর পারি না
দিবেন মা পদছায়া
স্থান দিবেন আমারে।

যে কিশোর মেয়ের সাজ প'রে নৃত্যগীত করে সে-ই আসরের প্রধান আকর্ষণ। পুরুষ নেবে স্বামীর বা প্রেমিকের ভূমিকা। আর কিশোরীর বেশে কিশোর নেবে স্ত্রী বা প্রেমিকার ভূমিকা, দলের এই দুজনেই মুখ্য গায়ক। বাকী সকলেই দোঁহার। উভয়ের মাঝে ছড়া ও গীতের মাধ্যমে সংলাপ চলে। তারপর যখন কিশোরী নাচতে সুরু করে তখন দোঁহারেরা ধুয়া ধরে। আসর মেতে উঠে। কখনও প্রবাসী দয়িতের উদ্দেশ্যে দয়িতার গান শোনা যায়—

আমারে না মনে পড়ে
তোমার হে বন্ধু
দূর বিদেশে গিয়ে।
তুমি থাক দূর বিদেশে
আমি থাকি পাগল বেশে
আশায় আশায় পথ চাহিয়া হে বন্ধু।

কিশোরী জানায় তার মনোবেদনার কথা। শ্রোতার হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠে।

আমার হৃদয়ে জাগালো মায়া রে
কোন বনে ডাকিলি কোকিল রে
সময় না বুঝিয়া রে।

কোকিলের কুহুরবে যৌবনের আবাহন। বিরহকাতরা কিশোরীর মন হুহু করে উঠে। অসময়ে কেন ডাক দেয়?

পাখী বলে যাও রে—
নীল আকাশে মন উল্লাসে
কোন বা দেশে যাওরে পাখী বলে যাওরে।
বন্ধুর দেশে যাইও রে পাখী ব'লো আমার কথা
জানাও ওরে পাখী আমার মনের ব্যথা
তুই যে আমার হৃদ্‌মন্দিরে মোহন মূরতি
সকাল সন্ধ্যায় ওরে পাখী করিতাম আরতি
ওরে পাখী ব'লে যাও রে—

প্রেমের সেই সার্বজনীন রূপ। যুগ হতে যুগান্তরে শুধু পাত্রপাত্রী আর ভাষা বদলেছে। বিরহী যক্ষ জানিয়েছে যক্ষপ্রিয়াকে তার প্রাণের কথা মন্দাক্রান্তা মেঘের মাধ্যমে। সেই ভাবই নিবেদিত হচ্ছে আকাশের পাখীর

কাছে। অন্তরের এই আকুল আহ্বান ব্যর্থ হয় না। ভ্রমর এসে কানে কানে শুনিয়ে যায় তার আগমনবার্তা—

নীল আকাশের কূলে দীঘির কালো জলে
দীঘির স্তরে স্তরে পদ্ম ফুটে রয়।
পদ্মফুলের রূপে ভ্রমর চুপে চুপে
ভ্রমর আসি মোর কাছে কানে কানে কয়।

দয়িত ফিরে আসে অভিমানিনী প্রিয়াকে সান্ত্বনা দেয়—

নে, নে, নে, পিয়া মুছে নে চোখের জল
সোনারই বন্ধু তুমি কেঁদ না তুমি
মুছে যাবে চোখেরই কাজল
হা-হা কর না পিয়া ছল।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মিলন। প্রেমের অভিষেকে মেতে উঠে দুজনেই। গান গেয়ে ওঠে :

জীবনে মরণে বন্ধু, মনে রেখ প্রিয়জনে
বাজুক মধুর বীণা দিবানিশি তব সনে
মুখভরা মোর মধুর হাসি, বুকভরা মোর প্রেমরাশি
বিভরণ হ'ক আজি দিবানিশি তব সনে।

প্রেমোচ্ছল কণ্ঠে যৌবনেরই জয়গান। সমাজ সংসার ভুলে গিয়ে শুধু নাচ আর গান।

না জানি কোন্ সাধের পানে কোন্ প্রেমে পরাণ ফাঁসি
আমি তো পান দিব না, পান দিব না আপন মনে ভালবাসি।
আদর করে খেলে, ধরে আবার গলে
ওগো আমি তারা তুলে পরাবো
করবো চুলে চুরি চাঁদের হাসি।

তারপরই— ভোরের হাওয়ায় এলো রে খবর
বিয়ে বিয়ে ফুটলো রে ফুল
চোরের পা হঁটায়[৩৩] পা দিয়ে
সকুলি[৩৪] গেল জাতিকুল

৩৩। হাঁটু
৩৪। সকলই

খেয়্যাছ কি লাজেরই মাথা
হারিয়ে দিয়্যাছ জাতিকুল।

মনের সাধ পূর্ণ হ'য়েছে। প্রিয়জনকে একান্ত করে পেয়েছে। বিবাহান্তে স্বামী সোহাগ করে—

সোনার বরণ কন্যারে সোনার নায়ে[৩৫] চাপ রে।
চল আমার বাপের বাড়ী। আমার বাপের বাড়ী যাবা
নানান রকম জিনিষ খাবা, খাবা আরও পান্তাভাতে ঘি।

তারপরই সুরু হয় বিবাহিত জীবনের রূঢ় বাস্তবতা। কর্মক্লান্ত পুরুষটি গান গায়—

দে না খেতে হাল বাইতে যাব সুন্দরী *
গেলাম মাঠে হাল বাইতে ভোকে[৩৬] লাড়ি[৩৭] কুঁ কুঁ করে
কেন যায় লাহারি[৩৮] গেলাম মাঠে হাল বাহিতে—
লাঙ্গল ভাঙলাম আড়াই পাকে।

সুখে দুখে দিন কাটে। সেই মেয়ে এখন মেয়ের মা। ঘোর সংসারী। স্বামীর উদ্দেশ্যে বলে—

শুন হে স্বামী বলি আমি মনের বাসনা
জামাইকে আনতে পাঠাও না।
জামাই এলে বাড়ি, লাগবে হুড়াহুড়ি
সাদ্ করে কর‍্যাছি লবান[৩৯] কেমনে খাব
জামাইকে আনতে পাঠাবো।

এমনিভাবে শেষ হয় একটি পারিবারিক চিত্র। কখনও বা শোনা যায় স্বামী-স্ত্রীর প্রেমালাপ—

৩৫। নৌকা
৩৬। ক্ষুধা
৩৭। নাড়ি
৩৮। জলখাবার
৩৯। নবান্ন

* গানগুলি মুর্শিদাবাদ জেলার নওদাগ্রামের আবু হোসেনের (৩৫) নিকট প্রাপ্ত।

স্ত্রী : তব ভালবাসা প্রাণে জাগে মোর প্রাণে জাগে
পুং : তাইতো আমি পিছু পিছু ফিরি সঙ্গে সাথে
স্ত্রী : আমি যে দেব না ধরা
পুং : কেন, কেন—কেন প্রিয়া ? তব আশার প্রদীপ
প্রাণে জাগে মোর প্রাণে জাগে।
স্ত্রী : চলে গেলে আঁখির আড়ালে তবু থাক হৃদয় জুড়ে—
তব স্মৃতিটুকু প্রাণে জাগে মোর প্রাণে জাগে।

মাঝে মাঝে এমন সব ইঙ্গিতও আলোচনায় এসে পড়ে—যা সংস্কৃত সমাজের আসরে অপাঙক্তেয়। মাঝে মাঝে কোনও চটুলস্বরে হিন্দীগানও হয়। আবার রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার প্রভাবও এসে পড়ে—

আর ভুলবো না শ্যামবঁধু
কোন ঝড়ের বাঁশি হে তুমি
সত্য করে বল হে বল।
ও বিদেশী মন উদাসী
বাঁশের বাঁশী চিকন কালো
কোন ঝড়ের ঐ বাঁশি হে তুমি
সত্য করে বল হে বল॥

জেলে আগুন পালিয়ে গেলি নিভায়ে গেলি না রে কালা।
ভাঙাতরী ডুবায়ে দিলি ধর্ম রাখলি না রে কালা॥
না হয় নিজের মন নিজেই বুঝাবো রে কালা।
পানে[৪০] তো মরবো না কালা॥

কখনও বা গানের মাঝে তত্ত্বকথাও ব্যক্ত হয়—

অন্ধকারে ভয় কিরে তোর
সুরের মশাল লাও হাতে
সুরের বাতি দিবারাতি রে
জ্বলবে তোর কবরেতে
পাঁচ কলেমার তিরিশ দানা রে

৪০। প্রাণে

এই সুরের সামিয়ানা
সুরের মশাল নাও হাতে।

সমসাময়িক ঘটনা বা সভ্যতার অগ্রগতির কথাও ব্যঙ্গচ্ছলে গীত হয়—

ধন্য ধন্য কলিযুগে করি নমস্কার
চা-সুন্দরী যে যুগে হ'য়েছে প্রচার
হেন চা-এর জন্ম হয় এই কলিযুগে
আদরেতে লাগিতেছে মানবের ভোগে
নমস্তে পত্রিকারূপী আসামবাসিনী
দুগ্ধসঙ্গে মিশ্র হও—গোলাপরূপিণী
... ...
... ...
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আজ এই কথা বলেন
দোষ না হয় চা খেয়ে, বিষ্ণু সেবা করেন
অপার মহিমা তোমার না পেলাম অন্ত
দেখো যেন মা শেষকালে না হই সর্বস্বান্ত।

অথবা—

দাদা সকাল বেলায় চান[৪১] করে সরবৎ খেলাম পিঁয়ে[৪২]
ইলশে তাজা পটল ভাজা খেলাম ভাত দিয়ে
দুদণ্ড তামাক খেলাম
দুখিলি পান নিলাম হে পকেটে
চলে গেলাম্ গুজার[৪৩] ঘাটে
গুজার ঘাটে তাড়াতাড়ি
দুই মাঝি বসাইলাম দাঁড়ি
যখন নৌকা মাঝখানেতে
ঝড় তুফান উঠলো বটে
ও আমার মন হইল ভারি

৪১। স্নান
৪২। পান ক'রে
৪৩। ফেরীঘাট

আমি রূপায়[৪৪] কি করি
চলে গেলাম নবাববাড়ী তাড়াতাড়ি
নবাবের হাতে নাইখ' পয়সা
আবার দেখছি ঘোড়া দৌড়তে।
হাসপাতালে কাটাকুটা
করছে মানুষ করছে গুটা
শিশিতে ওষুধ আছে পুরা
আবার করে দিয়েছেন খাড়া গো
আলিপুরের চিড়িয়াখানা
তাই দেখে মন আসতে চায় না
দেখছি অনেক রকম পাখি
দেখতে তোরে বাকি।

ঝুমুর

যদিও ঝুমুর আজ একধরণের ব্যবসায়ীর নাট-সঙ্গীতে এসে পর্য্যবসিত হ'য়েছে তবু এই গানে আদিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেণীর অবদান সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। বাংলার সীমান্তবর্তী সাঁওতালপরগণা ও ছোটনাগপুর অঞ্চল ও মধ্যপ্রদেশের পূর্বভাগে আদিবাসী সমাজে এই গানের সমধিক প্রচলন। উত্তর-রাঢ়ের প্রান্তিক এলাকায় যে সব উপজাতির বাস—তারা বর্তমানে দোভাষী হ'য়ে পড়েছে। ব্যবহারিক প্রয়োজনে ও সামাজিক উৎসবে এরা এদের নিজস্ব ভাষার সাথে বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে। তাই বিভিন্ন উপজাতি ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মাঝে বাংলা ঝুমুর গানের প্রচলন দেখা যায়। পারিবারিক বা সামাজিক উৎসবে নাচের সাথে ঝুমুরের গান চলে। গানের কথা সহজ—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রেমকেন্দ্রিক। সুরও জনপ্রিয়। অল্প কথায় গান রচিত হয় এবং গানের পদের পুনরাবৃত্তি চলে। সাঁওতালী নাচের মতই নাচ।

পন্থ ছাড়ো কালা
এবার হইল ঘর যাবার বেলা
শুন শুন কারিগর

৪৪। উপায়

গায়ে দিব আবরণ

পন্থ ছাড়ো

আদিবাসী সমাজের নিকষকালো এই প্রেমিক ও বাংলার লোকসঙ্গীতের শ্রীকৃষ্ণ একই ব্যক্তি। প্রণয়িনী সারাদিনই কাটিয়েছে তার দয়িতের সাথে। বিশ্বসংসার ভুলে তাদের এই প্রেমের খেলায় ব'য়ে গেছে সারাবেলা। প্রণয়িনী তাই ঘরে ফিরে যেতে চায় কিন্তু প্রেমিকের আশা মেটে নি। সারাদিনের সঙ্গ সুখের আবেশ মুছে দিতে চায় না মন। তাই পথ আগলে বসে আছে প্রেমিক।

এ গান আদিবাসীর নিজস্ব। একান্তই মৌলিক। কালক্রমে বাঙলার লোকসঙ্গীত প্রত্যন্তবাসী এই আদিবাসীর লোকসঙ্গীতকে সাঙ্গীকৃত করে নিয়েছে। সাঁওতালপরগণা সংলগ্ন পল্লী অঞ্চলগুলিতে বাঙলার অন্ত্যজ সম্প্রদায় কোথাও কোথাও কিছু ভাব ও ভাষা পরিবর্তন ঝুমুর গানকে নিজস্ব সংস্কৃতির পর্য্যায়ভুক্ত করে নিয়েছে।

বাউরী সম্প্রদায়ের মেয়েরা নাচের তালে তালে যে কোন উৎসবে গায়—

ওরে পাখী রে দেখেছো কি তারে যেতে
কাঁন্দায়ে কাটায়ে সারা রাতি রে
ধূলাতে অঞ্চল—পাখি রে
গাঙ বাঁকা, নদী বাঁকা বাঁকা গাঙের পানি
তাহার চাইতে অধিক বাঁকা
বঁধুর নয়নখানি রে
ধূলাতে অঞ্চল—পাখি রে।

গায়িকার বিরহিণীরূপ। প্রেমের চিরন্তন বিরহবেদনায় কাতর নায়িকা পাখীর কাছে তার মনের কথা ব্যক্ত করছে। নায়কের অদর্শনে চঞ্চলা নায়িকার আঁচল ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে।

গ্রামদেশের ভল্লাসম্প্রদায় গান করে—

পলাশ বনে রে ভাই—রঙ ছড়াইলো কে ?
রঙিন দেশের রঙিন বঁধু—তারে এনে দে।
রঙ ছড়াইলো কে ?
সমুদ্রের ঐ কালো জলে রে
নানারকম পাশা খেলে রে

ঐ নামেরই কালো বঁধু
মন ভুলাইয়া দে।
রঙ চড়াইয়া দে ॥
পলাশ বনে রে ভাই রঙ ছড়াইলো কে ?

পলাশের বনে যৌবনের অভিষেক। প্রকৃতির অঙ্গে যৌবনের রূপসজ্জা। বনে বনে রঙের খেলা, নায়কের মনেও রঙ ধরিয়েছে। তার মনে তাই রঙিন দেশের রঙিন বঁধুর কামনা। এমন ফুলরাঙা পরিবেশে সেই অচিন দেশের যৌবনরূপরাঙা মনের মিতা ছাড়া প্রাণের কথা বলবে কাকে ?

ঘাটোয়াল সম্প্রদায়ের সমাজজীবনেও এই গানের প্রভাব দেখা যায়—

হাতে লেবো কাটারী
চলে যাবো কাছারী
মাঝ বনে লাগাবো ঝুমুরী
গেয়ে মাঝো বনে

জনপদে নয়—জনপদ ছাড়িয়ে বনের মাঝে প্রিয়ার সাথে—ঝুমুর নৃত্য করবে। মধুর প্রাকৃতিক পরিবেশই প্রিয়াসঙ্গসুখ লাভ করবে। ঝুমুরের নাচ গানই হবে এই সঙ্গসুখের সহযোগ।

উৎসবের রাত্রে ধাঙর সম্প্রদায়ও ঝুমুর গানে মুখর হয়ে উঠে :—

বুড্ডা বুড্ডী কার্ম্মা গারায়তে
সাতদিন ঝুমারী খেল
ও ঝুমারিকা সোমায়ে
নিদ নাহি আয়
মাই তোরে যাবো
কুমারিকা খেল।

উৎসবের সময় সাতদিন সাতরাত্রি ধরে যে ঝুমুর নাচগান চলে—তাতে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই অংশ গ্রহণ করে। সারাদিন কেটে যায় ঝুমুরের নাচগানে।

ঘাটোয়ালদের প্রেমজীবনে ঝুমুর গানের প্রভাব বোধ হয় সর্বাধিক—

ফুটিল গোলাপ রে ভমরা চবাল
পাতা ছিল, কুড়ি ছিল ফুল ফুটালো
পিয়া নাহি আয়ারে
ফুটিল গোলাপ রে—ভমরা চবাল।

—গোলাপের কুঁড়ি—সে তার জীবনের স্বপ্ন সফল করেছে ভ্রমরের পরশে। যে কুঁড়ির যৌবন ফুটি ফুটি ক'রেও ফুটছিল না—ভ্রমর এসে তার যৌবনের পাখা মেলে দিয়ে গেছে। ভ্রমর গরবে গরবিনী ফুল তার সম্পদের কথা ঘোষণা করছে। প্রকৃতির রাজ্যে প্রেমের এই সার্থকতার মত কবে নায়কনায়িকার মিলনে জীবন ফুল হয়ে ফুটে উঠবে ?

নিশীথ জাগিল ফুলবনে রে ভমরা
ফুল যেন তুলো না। পাতা যেন খ'সে না হে ॥
তোমার জন্য ধরে আনবো সোনারই মেয়ে গো।
নিশীথে জাগিল ফুলবনে রে ভমরা।

বিরহকাতর মনকে সান্ত্বনা দেয়—বিরহীর জন্য সোনার বরণ মেয়ে নিয়ে আসবে। প্রকৃতি যেমন সাজে সেজে আছে—তেমন সাজেই থাক।

সাঁওতালদের উৎসবেও ঝুমুর গান শোনা যায়—

চাঁদ উঠে ঝিকিমিকি
সুরয উঠে জ্বালা
রাম বিন্দিরে ময়রা ঘরে
আলা আন্দারে।
তেল নাইরে বাতি নাই
বাতি নাইরে দেয়ালা
রান বিন্দিরে ময়রা ঘরে
আলা আন্দারে।

বাঙলার লোকসঙ্গীতে ঝুমুর গানের স্বাঙ্গীকরণের পর এই গানে অনিবার্য্য-কারণেই রাধাকৃষ্ণের কথা অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

চিনিলে না সহচরী
আমি শ্রীরাধার প্রহরী
দ্বারে থাকি ধরে অসি ঢাল গো
মোরে চোর বল—কি জঞ্জাল।
করিতে দেবী পূজনে
করি কমল চয়ন
কাটা দাগ হৃদয়ে বিশাল গো
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল।

পূজেছিলাম ভগবতী
তাহার প্রসাদ দুতী
সিন্দুরে কজ্জল মাখা ভাল গো
মোরে চোর বল—কি জঞ্জাল।

আবার ঢ্যাকারো সম্প্রদায়ের ঝুমুর গানেও রাধাকৃষ্ণের লৌকিকরূপ

চৈত বোশেখ তাপ   শেল মারে বুকে হে
রাধা বিনে অভাগিনী   শেল মারে বুকে হে
চৈত বোশেখ তাপ   লাগিল চাঁদ মুখে
রাধা বিনে অভাগিনী   শেল মারে বুকে হে।

চৈত্র বৈশাখের দগ্ধ নিদাঘের যে দহনজ্বালা—শ্রীরাধিকার অদর্শনেও প্রাণে সেই দহনজ্বালা এনে দিয়েছে।

শ্রীরাধা কাতর কেন   শ্যামছাড়া প্রাণধন
এসো বন্ধু হিদ্‌মাঝে ধরি
চিনিতে না পারো বংশীধারী।
না গাথিলে ফুলমালা   না ডাকিলে সুবল ব'লি
সুবল নহি আমি প্রাণেশ্বরী
এসো বন্ধু আমি হিদ্‌মাঝে ধরি
চিনিতে না পারো বংশীধারী

ঝুমুর গানে কখনও কখনও তত্ত্বকথাও শুনতে পাওয়া যায়—

দহের মাছ পড়ে না ডাঙ্গালে
ঝাঁপ দিলে ভব জলে
দহের মাছ না পড়ে ডাঙ্গালে
যদি হ'বে রুই কাতলা
ঘুচাও হে মনের মাতলা
ঘুরে ফিরে পড়ে মোটা জালে।
ওরে আমার মনমীন, দিনে দিনে বুদ্ধিক্ষীণ
ঘুরে ফিরে পড়ে ঘুনি জালে।
দহের মাছ………ডাঙ্গালে।
ওরে আমার নিঠুর
তোর মনে মনে বুদ্ধি জোর

পাঁক কেটে চলে যাবো কাদার ভিতর
দহের............ডাঙ্গালে।

বাউরীদের ঝুমুরগানে মায়াবাদের দর্শনও শোনা যায়—

এ তুনিয়ায় মায়ার বাঁধন
কেবলমাত্র ছয়ারে[৪৫] ছয়া
মুদলে পাখী সকল আঁখি
পড়ে র'বে কয়া[৪৬]
এ তুনিয়ায়..... ...ছয়া।
টাকাকড়ি জমিদারী কোথায় পড়ে রবে
ছেঁড়া তলায়[৪৭] লেয়াল[৪৮] দড়ি
সেই তো যাবে সঙ্গে রে সঙ্গে
এ তুনিয়ায়.........ছয়া।

মেঘের আগমনে ভল্লী সম্প্রদায় গান গায়—

কাজলা মেঘে আড়ালে হ'তে ওলো
কার হাসি ফুটলো, ফুটিলো লো
মাঠে ঘাটে জল নাই ডাঙ্গাতে হল সাঁতার
কাজলা মেঘে .... ওলো।

অনুরূপ গান ধাঙড়রাও ইন্দ্রপূজা উপলক্ষ্যে গায়—

পুকুরেতে জল নাই ভাই ডাঙ্গালে সাঁতার
কালো মেঘ কালো মেঘ করেছে আঁধার।

ঝুমুর গানে প্রেমবিষয়ক ছাড়া অন্যান্য বিবিধ বিষয় দেখা যায় ধাঙড়দের—

ছোট পারা পাখিটো চালে করে বাসা
খাজনা পাতি না দেই তো মার খায় গো চাষা।
শুঁড়ি ঘরে মদ খায় কোটাল ঘরে বাসা
খাজনা পাতি না দেয় তো মার খায় গো চাষা।

৪৫। ছায়া
৪৬। কায়া
৪৭। তালাই (তালপাতার তৈরী)
৪৮। নারকেলের

ঘাটোয়ালদের—

আমার নাতি বড় ছাতি। দুয়ারে বাঁধিলাম হাতি ॥
যত লাগে গুণ লাগে। তবু না ছাড়িব জমিদারী ॥

ঢ্যাকারোদের—

ঠিক দুপুর বেলা কে মারিলি ঢেলা
ঢেলা নয় গো তামাখলের পটলা
শিক দিহে রসিকা অবলা।

এমন কি ঝুমুর গানে সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

কি কারখানা করলে সাহেব শুঁড়িচুয়াতে এসে
কত ইটের ভাঁটা থাকলো পোড়া ভাটিনার ডাঙ্গাতে।
কি কারখানা............এসে ॥
ধরণী শুঁড়ি, শম্ভু তাঁতি—ইঁদারাতে কাটতো মাটি
বাউরীর দলে মিশাল হয়ে পারে না চোটাতে।
কি কারখানা.....................এসে ॥
একখানা চালায় উত্তর-দক্ষিণ
আর একখানা পুব্-পশ্চিম
ভাটিনাতে দিলে নিশান জাহাজ নামবার লেগে।
কি কারখানা......... ....এসে ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন বীরভূম জেলার রামপুরহাট সংলগ্ন শুঁড়িচুয়াতে বিমান অবতরণের স্থান নির্মাণ প্রসঙ্গই এই গানে আলোচিত হয়েছে।

ঝুমুর গানগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে অধিকাংকশ গানই চারটি পদের। পরবর্তীকালে অবশ্য আট বা দশটি পদের প্রচলন হয়েছে। দ্বিতীয় পদের পুনরাবৃত্তি করে চতুর্থপদ পুরণ বা প্রথম পদের পুনরাবৃত্তি করি চতুর্থ পদের পুরণ অথবা প্রতি একটি পদ অন্তে দ্বিতীয় পদের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। সঙ্গীতে রূপকের ব্যবহারও দেখা যায়।

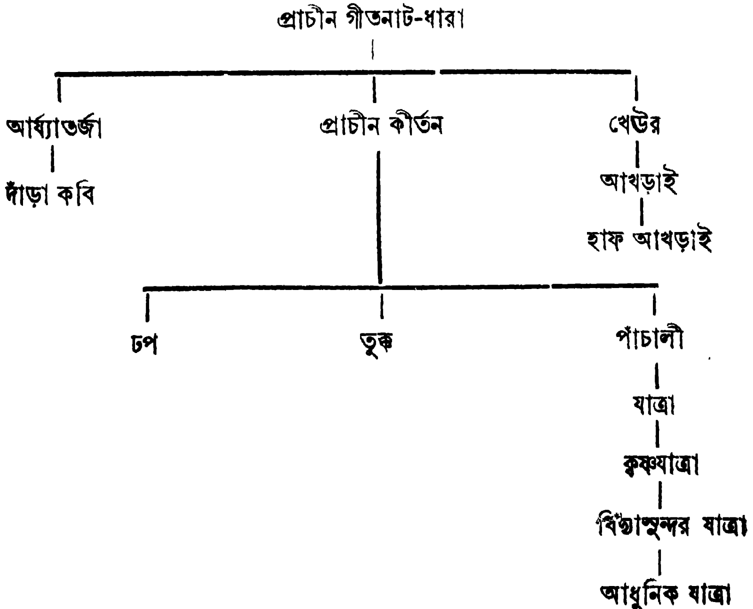
সাঁওতালদের ঝুমুর গানে মাদল ও বাঁশী, ধাঙড়দের ঝুমুর গানে মাদল ও নাগরা, ঘাটোয়ালদের ঝুমুর গানে মৃদঙ্গের ব্যবহার আছে।

পূর্ববাঙলার জারিগানের মত ঘাটোয়ালদের দুইটি পুরুষ দুই হাতে গামছা নিয়ে নৃত্য করে। দুজন মৃদঙ্গ বাজায়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সচরাচর মেয়েরাই নৃত্য করে।

লেটো

উত্তর-রাঢ় এলেকায় লেটো বা লোটো খুব জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। পরিবেশনের রীতি বা বিষয়বস্তুর দিক হতে এই গান কতকাংশে আলকাপধর্মী। মণি বর্দ্ধন লিখেছেন—'নাট্যের অপভ্রংশ শব্দ হচ্ছে লাট্য। লাট্যের সংক্ষিপ্ত নাম লেটো।' সাজসজ্জা পরে পালাগান গাওয়ার রীতি আছে। পালাগান ও তর্জাগানের মাঝে অশ্লীল বিষয়বস্তুও এসে পড়ে। গায়ক ও শ্রোতৃবর্গের রুচি অনুযায়ী স্থূলমানের নৃত্যগীত পরিবেশিত হয়। সাধারণতঃ মুসলমান সমাজের অধিবাসীরাই এই গানের গায়কের দল গঠন করে। শ্রোতাদের মধ্যে মূলতঃ হাঁড়ি, বাউরী, বাগ্দী ইত্যাদি সম্প্রদায় ও অশিক্ষিত মুসলমানদের বেশী দেখা যায়। এই গান সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের অভিমত: 'কবিগানের মধ্যে শ্লীলতার গণ্ডী প্রায়ই মানা হইত না। আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভবের সাথে সাথে ইহা লোপ পাইল। এখনকার দিনে পল্লীগ্রামে স্থানে স্থানে তর্জাগান ও ইহার রূপান্তর লেটো বা লোটো (নাটুয়া) গান অশিক্ষিত মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে।'

প্রাচীন গীতনাট-ধারার নিম্নলিখিত বিশ্লেষণ মেনে নিলে লেটো গানকে তর্জা, খেউড় ও যাত্রাগানের সংমিশ্রণ বলেই মনে হয়—



অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৃত্য বাইজীসুলভ। ইহাতে পালাগান, হিন্দীগান ও তর্জা গানের প্রভাব দেখা যায়। কখনও গান বন্ধ হয়ে যায়—চলে শুধু দুই দলের মাঝে ছড়া কাটাকাটি বা সংলাপ। কখনও বা যাত্রাদলের মত পুরা একটি পালা গান গীত হয়। অভিনেতারা সাজসজ্জা পরে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে।

প্রথমে গান সুরু হওয়ার আগে আসর বন্দনা হয় যৌথকণ্ঠে বা একককণ্ঠে—

পহেলা বিসমিল্লা আল্লার নাম লেহে জোবানে[৪৯]।
যার কুদরতে[৫০] আসমান খাড়া গো রাখলে বিনা যতুনে ॥
তাহার পরে সালাম আমার নুর নবীজী জুলজবিনদার
তাহার পরে সালাম আমার সেই নবীজীর চারজন ইয়ার[৫১]
আবু বাক্কার, উম্মর, ওসমান, আলি জরু আর যিনি ॥
জানো সে মোর তুজি আলি, দিনদুনিয়ার হয় গো অলি[৫২]
তে গজুল ফুকার বোকসেছিলেন আপেরি সোভানে[৫৩] ॥
জিন্নত খাতুন নবীর বেটি বরকতধ্বনি দিনের খুটি।
বেহেস্তের দুয়ারে বাতি হাসেন হোসেন দুইজনে ॥
মা হাওয়া বাবা আদমে সালাম গো তাদের বাদমে
যত মোমিন[৫৪] পয়দা হ'ল দেখ তাদের সেকমে[৫৫] ॥

লেটো গানের মধ্যে কখনও কখনও দেহতত্ত্বও শোনা যায়—

আমার দুকুল পাথারে ভাসে এ নব তরী
টলমল করে নৌকা তুফান ভারী।
আছে কত রাস্তা বাঁকা নফ্স[৫৬] ও পরদাতে ঢাকা
ভাটিতে চলিছে নৌকা—ছয়জনা দাঁড়ি

৪৯। জিহ্বা
৫০। দয়া
৫১। বন্ধু
৫২। সর্দ্দার
৫৩। খোদা
৫৪। বংশধর
৫৫। বংশ
৫৬। শিরা

কি মতি মাল বুঝাই আছে চড়াতে লাগে না পাছে
বুঝে সুঝে হাল ধরেছে ও মুন কাণ্ডারী
সুবাতাস ও পাই গো যদি
চলে নৌকা নিরবধি
যাবে ঘাটে মহম্মদী ঢেগুর মারি
ঘাটে আছে দুজন দালাল চিনে নেবে হারাম হালাল
বেচাকেনা করিবে মাল করে সবুরী[৫৭]
ভেবে কইছে মুনতাজ আলি, শুনরে মন তোরে বলি
সোজা পথ যাবে চলে ওজানে তরী।

কোনও বিশেষ এক ব্যক্তির রচিত তত্ত্বমূলক সঙ্গীতকে ঠিক লোকসঙ্গীতের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না, একথা সত্য কিন্তু এই গানের পরিবেশনরীতি ও ক্ষেত্র এমনই বিচিত্র এবং এর আবেদন অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে এতই গভীর যে গূঢ় তত্ত্ব-কথার উপরে গানের ভাব, সুর পরিবেশ প্রভৃাত মিলিয়ে সরল শ্রোতৃহৃদয়ে এমন রেখাপাত করে যা একমাত্র লোকসঙ্গীতেই সম্ভব।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে যায়। দুই দল দুই পক্ষ অবলম্বন করে। একপক্ষ গান করে কাপাস বা বিশেষ এক শ্রেণীর ফলের ভূমিকায়—ব্যঙ্গ করে 'দানা' বা খাদ্যশস্যকে—

ওহে দানা করি মানা গৈরব করো না
আমার সাথে উচিত মত হয় না তুলনা।
সাত খানা খাব না কাপড়খানা খুলে দাও না
কেমনে ইজ্জৎ রবে আমায় বল না।
বারো বৎসর খায় নি দানা মরে নি হানিফ মর্দ্দানা
কেতাবেতে আছে শোনা ও ভাই মোমিনা[৫৮]
দানা দানা করো বটে ছুরি মারো অমন প্যাটে
নইলে কাপড় পরে ভবের হাটে যাওয়া যাবে না।
দেখ আমার বাহাদুরী পরছে কাপড় নরনারী
বুনছে কত ঢাকাই শাড়ী আরও চারখানা।

৫৭। ধৈর্য্য
৫৮। শ্রোতাগণ

অধীন মুস্তাজ ভেবে বলে গাওনা[৫৯] কর কাপড় ফেলে
আবার হঠাৎ মরণ হলে পরে কাফন দেব না।

প্রতিপক্ষ উত্তর দেয় গানের মাধ্যমেই। প্রশস্তি করে দানা বা খাদ্যশস্যের—

দানার নিন্দার করে দেখ অরাই[৬০] কয়জনা
কাপাস খেয়ে মানুষ হ'ল দানা চেনে না
দানার বাসন ধরতে গেলে ঠুকর মারবো অদের গালে ॥
এ দানাতে হয় বা কি খিচড়ি, পোলাও, হালুয়া, রুটি
এ দানাতে সবই দেখ চালায় কারখানা
দানার নিন্দা করো তুমি কিছুতে ছাড়বো না আমি
সভার মাঝে বেশী কথা আমায় ব'লো না ॥
অধীন অমুক ভেবে বলে দানা খাও হে ভাই সকলে
দানা না খাইলে পরে কেহ বাঁচবে না।

এইভাবেই আত্মপ্রশস্তি ও প্রতিপক্ষকে নিন্দাবাদের মাঝেই গান জমে উঠে। রসিক শ্রোতার মন ব্যঙ্গরসিকতায় পুলক অনুভব করে। মাঝে মাঝে অশ্লীল প্রসঙ্গও এসে উপস্থিত হয়। কিশোরীর বেশে কিশোর অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ নৃত্য করে। দুইপক্ষ কখনও মা ও বাবা, কখনও লোহা ও সোনা, নামাজ ও ইমান—ইত্যাদির ভূমিকায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামে। যখন এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ খুব জমে উঠে তখন ব্যক্তিগত আক্রমণও চলে—

তোরে তো বলি নাই শালা
শুনেছে দশজনা
কয়রকমের আছে শালা তার নাইখ' ঠিকানা।
আখশালা, ঢেঁকিশালা, হাতীশালা
ঘোড়াশালা, পাজিশালা গায়ে শাল দোশালা নাই ?
তোরা শালা বলা নাই।
তোকে তো বলি নাই কানা
শুনেছে দশজনা
কয়রকমের আছে কানা তার নাইখ' ঠিকানা

৫৯। গান
৬০। ওরা

ডিঙলে কানা, পটোল কানা, ঝিঙে কানা
হাঁড়ি কলসী কানা নয়?
তোকে কানা বলা নয়।

সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহও লেটো গানের মাঝে এসে পড়ে—

আধুনিক যুগ অতি চমৎকার
ধন্য ধন্য যুগের ব্যবহার
আধুনিক.........চমৎকার।
... ...
... ...
সেকালেতে অনেকজনা 'ক' দূরে থাক 'অ' চিনতো না
(গোবরের) দাগ দিয়ে তারা রাখতো হিসাব কত উস্থল কত ধার
অতি চমৎকার।
কংগ্রেস গরমেণ্ট ইহা জানি মনেতে সংশয় মানি
পাড়ায় পাড়ায় স্কুল দিল অসংখ্য মাষ্টার
অতি চমৎকার।
হাসপাতাল ছিল না বেশী তাও তো পেল ভারতবাসী
ছোট বৈগ্যের উঠলো চাটি পাশকরা ভাই সকলে ডাক্তার
অতি চমৎকার।

অথবা

এক টাকার চাল কিনতে গেলাম
তিন পাই বৈ আর মিললো না
কণ্টোলের গম খেয়ে খেয়ে
ক্ষ্যামতা বুঝি আর থাকলো না।

শ্রোতা ও পরিবেশ বুঝে এই জাতীয় গানে সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ, সভ্যতার স্তুতি ও নিন্দাবাদ দুই-ই পরিবেশিত হয়ে থাকে। আর চলে দেহতত্ত্ব আলোচনা। কখনও বা মায়াবাদও এসে যায়। যেমন—

এই দুনিয়া কেবল বালির বাঁধ
কোন দিনেতে যাবে জান্।
এই দুনিয়া কেবল বালির বাঁধ।

রায়বেশে

অনেকে মনে করেন যে রায়বেশে শব্দ বিটা>বিশ>বেশে থেকে এসেছে। বিট শব্দের অর্থ শক্তিশালী জনগোষ্ঠী। বিট থেকে 'বিশ' শব্দ এবং 'বিশ' হতে 'বেশে' শব্দের উৎপত্তি। শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর আচরণীয় কৌশলকে বলা হয় বিশ। আর রাজকীয় সম্মানবিশিষ্ট ব্যক্তিদের বলা হয় রায়। এই রায় অর্থাৎ জমিদারদের আশ্রিত ও পুষ্ট জনগোষ্ঠীই রায়বেশে গোষ্ঠী নামে খ্যাত। জমিদারদের মনোরঞ্জনের নিমিত্তে ও তাঁদের পারিবারিক উৎসবে আনন্দানুষ্ঠানের একটি অঙ্গ হিসাবে এই গোষ্ঠীর নৃত্যগীতের উদ্ভব। কিন্তু কালে কালে জমিদারদের আধিপত্য সঙ্কোচনের সাথে সাথে ও পরবর্তীকালে অবলুপ্তির পর এই জাতীয় নৃত্যগীত উত্তর-রাঢ়ের যে কোন উৎসবে বা মেলাখেলায়ও দেখা যায়। জন্মপত্রিকা বিচার করলে একে ঠিক লোকসঙ্গীতের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না, কারণ বিশেষ এক গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের জন্যই এর জন্ম। সুরুতে এ সঙ্গীতের সঙ্গে গণজীবনের সংযোগ ছিল না বললেই চলে।

মূলতঃ ভল্লা, বাউড়ী, বাগদীরাই এতে অংশগ্রহণ করে। নৃত্যপ্রধান এই গীতের সাথে ব্যায়ামকৌশলও প্রদর্শিত হয়। বোলান ও রায়বেশে—এই দুই গান উপলক্ষ্যেই এই জনপদের ব্রাত্য সম্প্রদায়ের মাঝে শারীর চর্চার অবকাশ ঘটে। দশবারোজনের একটি দল কাঠি নাচের গান গেয়ে উঠে—

কাঠির নাচো কড়ি—সারি রে
ও ভাই দিলেক্ মোরে সারি রে।
দিলেক মোবে সারি রে ॥
গাঙচিলে রে শব্দে মোরা
হ'লাম গুঁড়ি গুঁড়ি রে।
কোথায় ছিল চাঁদ
মেরেছে ফাগুড়ি রে।
মেরেছে ফাগুড়ি রে ॥

বাউল, বৈষ্ণব আর দরবেশ, ফকিরের দেশ এই উত্তররাঢ়। তাই আলকাপ, 'লেটো'র মত লঘু সঙ্গীতের মাঝেও তত্ত্বকথা এসে পড়ে এখানে। উত্তরবঙ্গের 'বাউলিয়া' বা পশ্চিমবঙ্গের বাউল, ফকিরের জীবনদর্শনে তত্ত্বকথাই মূল। গানে তার প্রভাব অনস্বীকার্য্য। কিন্তু উত্তররাঢ়ের প্রায় সব লোকসঙ্গীতেই তত্ত্বকথা প্রত্যক্ষ-ভাবে বা পরোক্ষভাবে স্পর্শ করেছে। রায়বেশে সঙ্গীত শিল্পীর কণ্ঠে শোনা যায়—

পাষাণের ভার নয় গো গুরু
পাপের ভার ঐ অতি গুরু
তিলপরিমাণ পাপের বোঝা
বইতে নারি। জগৎ লঘু
তাইতে ভারি রে রতি রতি।

বিবাহাদি উৎসবেও এই গোষ্ঠীর নৃত্যের সাথে সঙ্গীত শোনা যায়—

করবো না আর বিয়ে করবো না আর বিয়ে
বিয়ের আশা মিটে গেছে দাদার বিয়ে দিয়ে।
করবো না·· ·········।
বিয়ে করে এ কি জ্বালা বাড়াইলে দাদার শালা
লাঠি ঝাটা চলছে এবার দাদার উপর দিয়ে।
করবো না·············।
সুন্দরী বো আনলে ঘরে এবার জ্বালা বেজায় বাড়ে
আলতা সিন্দুর কিনতে হবে বাক্স বাঁধা দিয়ে।
করবো না············।

উপরোক্ত গানের পদ শুনে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে উচ্চবর্ণের হিন্দু-সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য এ গান নয়। সুন্দরী বৌ-এর সাধ মেটাতে গিয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত বা অন্ত্যজ পরিবারের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার একটি চিত্র ফুটে উঠেছে এই গানে। আরেকটি গান—

এবার বামা নিতে এলে—আর বামা পাঠাবো না।
ও শিব শ্মশানে থাকে—ঘরের খবর রাখে না॥
আসে যদি মৃত্যুঞ্জয়—বামা নেবার কথা কয়।
মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া—জামাই ব'লে মানবো না॥
শিব শ্মশানে শ্মশানে থাকে—গায়ে সে যে ভস্ম মাখে।
বামা একা থাকে ঘরে—ও শিব ঘরের খবর রাখে না॥
এবার বামা············।

গানটির মাঝে হরপার্ব্বতীর সাংসারিক চিত্রটি ফুটে উঠেছে। মহাদেব এদের ঘরের জামাই। শ্মশানাচারী শিব বামার খবর রাখে না। বিবাহিতা মেয়ের আত্মীয় পরিজন জেনেশুনে এমন একজন আত্মভোলা পুরুষের সাথে মেয়েকে ছেড়ে দিতে চায় না। 'জামাই' ব'লে কোন খাতির করা হ'বে না। মুখের

উপর জানিয়ে দেবে যে স্বামীগৃহে মেয়ের অযত্ন হয়, দেখাশোনা করার লোক নেই, তাই মেয়ে বাপের বাড়ীতেই থাকবে। আরেকটি গান—

সাজিয়ে দাও গো ললিতে যাবো সোয়ামী দেখিতে।
সে যে আমার প্রাণের হরি যদি পারি ভুলাইতে ॥
সাজিয়ে দাও আভরণ যেখানে যা লাগে যেমন।
সে যে আমার প্রাণের সখা যদি পারি ফিরাইতে ॥
হাতে দাও গো কঙ্কনচুড়ি কানে দাও গো কানকুণ্ডলী।
সে আমার প্রাণের হরি যদি পারি ফিরাইতে ॥

দীর্ঘকাল স্বামী সন্দর্শন হয় নি তাই ব্যাকুলা স্ত্রী সখীকে সাজিয়ে দিতে বলছে—এ 'ললিতে' শুধু রাধার সখী নয়—এ 'ললিতে' গ্রাম্যসমাজের, ব্রাত্য-সম্প্রদায়ের কিশোরী বধূর সাথী। সাথী জানে সখীর প্রাণের ব্যথা, মনের কথা। মনোহারিণীর বেশে সাজিয়ে দিতে হবে। স্বামী অভিমান করে চলে গেছে। তাকে ভুলিয়ে ফিরিয়ে আনতে হ'বে। কারণ—

বলি বিন্দে তোরে আজ নিশি ঘোরে দেখেছি স্বপন।
স্বপ্ন যদি না ভাঙিত তো স্বামী আমার হ'তো আদর্শন ॥
বলি বিন্দে......... ।
পরণে তার পীতধরা বদনে উজল।
পরশনে নিদ্রাভঙ্গ হইত শীতল ॥
আমার বঁধুর এই অপরূপ রূপ
দেখলে তোরা হ'তিস্ গৃহছাড়া।
বলি বিন্দে......... ।

সুখস্বপ্নে বিভোর প্রেমগরবিনী কিশোরী। স্বপ্নোত্থিতা কিশোরী তার পরানবঁধুয়ার রূপ বর্ণনা করছে সখীর কাছে।

উদ্দাম ও বলিষ্ঠ নৃত্যের সাথে এই গান চলে। সবল ও সুঠাম দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পেশীচালনার সাথে এই সঙ্গীত এক যাদুকরী পরিবেশ রচনা করে। বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে জনতা দেখে উদ্দাম গতির এই নৃত্য, সঙ্গীতের সুরে মাতাল হয় শ্রোতার মন।

স্মরণীয়, রায়বেশে নৃত্য ও গীতকে অবলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধার করেন বাংলার লোকনৃত্ত গবেষণার অন্যতম পুরোধা ও ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত। বঙ্গীয় ব্রতচারী সোসাইটী, ব্রতচারী নায়ক মণ্ডলী প্রভৃতির

প্রকাশিত গ্রন্থ ও কার্যক্রম ব্যতীত ও তাঁর সম্পর্কিত ও রায়বেশে বিষয়ক তথ্যাদি জানা যাবে শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত বিরচিত "ফোকলরিষ্ট অব বেঙ্গল" নামক গ্রন্থে।

কৃষকের গান

এই জনপদের অন্ত্যজ শ্রেণীর আবালবৃদ্ধবনিতার জীবনের একটি বৃহত্তর অংশ চাষের প্রয়োজনে মাঠেঘাটেই কাটে। সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই বাড়ী হতে বেরিয়ে যায় হালবলদ নিয়ে ফসলের ক্ষেতে। ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই। মাঝে মাঝে আলের ধারে বসে হুঁকো-কলকেয় তামাক সেজে টেনে নেয় নতুন উদ্দীপনার জন্য। হুঁকো হাত বদল হয়—চলে পরস্পরের সুখদুঃখের কথা। গতবারের আর এবারের চাষের সম্ভাবনা ও ফলশ্রুতির কথা। বেলা বাড়লে বাড়ীর মেয়েরা ছেলে কোলে করে এসে হাজির হয়, মাথার উপর থাকে এলুমিনিয়মের পাত্রে পান্তা ভাত আর পেঁয়াজ লঙ্কা। কখনও বা ডালবাঁটা। খেয়েই আবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। দিনের শেষে স্নান, তারপর খাওয়া। এত কাজের ফাঁকেও চাষীর প্রাণে সুর জাগে—সে সুর কখনও বিষাদের, কখনও পুলকের। সে গলা ছেড়ে গান ধরে সে গানের সুর চারপাশের আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। দূরের মাঠের চাষীও এই গানের সাথে গলা মিলিয়ে সাড়া দেয়। এ গান সারিগানের ও ছাদপেটানোর গানের মত কর্মবিষয়ক বা শ্রমবিষয়ক। গানের ভাব ও ভাষা খুব সহজ ও সরল। সুরে ভাটিয়ালী টান। কোন বাদ্যযন্ত্র নেই। কাজের গতি গানের তালের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলে। অনেক ক্ষেত্রে গানের ভাষার সাথে তাদের কর্মজীবনের কোন সঙ্গতি নেই। তবু এ গানের সুরে সাড়া জাগে, কাজ চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ পায় চাষী। সে গান সুরু করে—

বার বাংলো তেরো কুঠী মধু চৌকিদার
যার মাথাতে লাল পাগুড়ী—সঙ্গে দফাদার
চল যাবো মধুসূদন, তোর লেগে কি হারাবো জীবন ?

পাখীকে উদ্দেশ্য করে গান ধরে—

বন্ধুর দেশে পাখী এসে উড়ছে আকাশে
বল রে পাখী সত্য করে কে কেমন আছে ?

এখানেও রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ এসে উপস্থিত হয়—

কাল জলে পাথর চলে মন তো চলে না
দেশবিদেশে ঘুরে এলাম মরণ হল না।

শ্যামের মরণ হয় কিসে
আসানসোলে বিষবড়ি আছে।

আদিবাসী বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের অন্ত্যজ শ্রেণীর অধিবাসীরা তাদের কাজের ফাঁকেই গান জুড়ে দেয়। এ গানের দীর্ঘ বিলম্বিত উদাসী সুর ঝিমিয়ে পড়া দুপুরের ক্লান্ত পথিককে কেমন যেন বিমনা করে তোলে। পথ চলতে চলতে গাছের ছায়ায় থমকে দাঁড়ায় পথিক কয়েক মুহূর্ত। সামান্য একখানি গামছা বা ছোট্ট একটি ধুতি হাঁটুর উপর আঁটোসাটো করে পরা। গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে, কাজ চলছে, আর চলছে সমস্ত পথঘাট পরিব্যাপ্ত করে প্রাণখোলা গান—

উপর দেশে জল হইলো নামো দেশে জল নাই
বাদ বেইহেড় শুকি গেয়ালো দেশে রে ভগবান
এক এ ঝড়ে জল রে জমি কুড়কি
হিপিড় মানে মান।

অথবা—

বেরজিবাবু পুকুরঘাটে দাঁড়াইয়া
মোষ গেল শ্রীবৃন্দ রেলোই বনে
গাই গেল বিলনে বিলনে
মোষ গেল শ্রীবৃন্দ বেলোই বনে
বেরজিবাবু··· ···

অথবা—

রাণী চলিল সড়কে সড়কে হে
রাজা চলিল কাঁচি সড়কে
বাজার ছাড়া পড়িলা জলের ধারে
রাণী হাসিলা মনে।

বিজয়ার গান

সারা বছর ধরে ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর মেয়ে আসে তার বাপের বাড়ীতে মাত্র চারদিনের জন্য। তাই তার এত আদর। সারা বাঙলাদেশ জুড়ে আনন্দের আলোড়ন। এতো মেনকা আর গিরিরাজ দুহিতা দেবী দুর্গা নয়, এ যে তাদের ঘরেরই মেয়ে। সারাটা বছর আত্মভোলা স্বামীকে নিয়েই তার দিন কাটে। কতদিন পর মেয়ে এসেছে বাপের বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে। ঘরে ঘরে

নতুন কাপড় পড়া আর নতুন কিছু খাওয়ার ধুম। আদরের মেয়ে উমার আগমনে উৎসবে মুখর হ'য়ে উঠে সারা বাঙলাদেশ। এই আনন্দোচ্ছ্বাসের মাঝেই কেটে যায় তিনদিন। বিদায়ের বেলা ঘনিয়ে আসে। বাপের বাড়ীর খুশীর পালা সাঙ্গ হয়। মেয়ে চলে যাবে শ্বশুরবাড়ীতে। মেনকার সাথে বাঙলা-দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার চোখ ছলছল করে উঠে। যেতে দিতে প্রাণ চায় না তবু ছেড়ে দিতে হবে। বেদনায় ছলোছলো চোখ। কান্নায় ভেজা কণ্ঠে গ্রামের মেয়েরা গেয়ে উঠে—

আসবে আসবে ভালই ছিল
এসেই যেন চলে গেল
সকল কথা বলাই হ'ল না।
যাওয়ার কথা শুনেই দেখ
ভাসছে যে দেশ চোখের জলে
উমার পানে চাইতে পারে না।
বুক ফেটে যায় বিদায় দিতে
ছাড়তে কি মন চায় যে বল
যাবেই জানি তবু মন মানে না।

বিজয়া দশমীর দিন গ্রামাঞ্চলে অন্ত্যজশ্রেণীর একসঙ্গে অনেকে মিলে পরস্পরের হাতের লাঠিতে তালে তালে শব্দ করে গান গায় এবং একজন নাচতে থাকে। গানে ঘরোয়া রূপ—

ওগো শ্যামা বাগতেনী সাজ সেজেছে
কেউ যদি শুধায় শ্যামা কে তোমার স্বামী
কি বলিব কুলের কথা বাগ্‌তীর মেয়ে আমি॥
ওগো.............সেজেছে।

হাপু

এ অঞ্চলের গ্রামদেশে কোন কোন মহিলা বা ছোট ছেলেমেয়ে তাদের বগল বাজিয়ে বিচিত্র শব্দ করে অথবা পুরুষ একটি ছড়ি দিয়ে তার নিজের পিঠে আঘাতের দ্বারা বিচিত্র শব্দ করে এই জাতীয় গান গায়। গান-গাওয়ার ভঙ্গী বা পরিবেশনের রীতি সকলকেই আকর্ষণ করে, আনন্দ দেয়। শব্দের তালে তালে গান চলে—

হাপু আতাপাতা লো,
হাপু সর্ষেপাতা লো,
হাপু আম খাবি, জাম খাবি, তেঁতুল খাবি লো ?
তেঁতুল খেলে পেট গুলাবে—ছেলে হ'বে না।
হাপ—কাকে খেলে গো ?
হাপু—কে ঝাড়ুনী লো ?
হাপু—বদের মা-কে লো ?

আধুনিকাদের ব্যঙ্গ করে, গান রচনা করে—

ভালাসের ঐ মাঠে দেখে এলাম লো
হাপু—কে বটেলো, কে বটে ?
হাপু—বাবুদেরই বৌ বটে।
হাপু—মাথাতে সান্[৬১] কারা নাই লো
হাপু—পায়েতে জুতো।
হাপু—চোখে চশমা, হাতে ছাতা লো।
হাপু—গটগটিয়ে হাঁটে।
হাপু—পাল্‌কী মাঠেই থাকলো পড়ে লো।
হাপু—গাঁয়ে গেল সোয়ামীর হাত ধরে লো॥

বারমেসে

মহাদেবের গাজন উপলক্ষ্যে ভক্ত্যার দল গান গায়—

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা ঘটে আলিপন।
অবশ্য আসিবেন প্রভু করিবেন স্থাপন॥
কার্তিকে কালিয়াদমন খেলেন বনমালী।
কালিদহে দিয়ে ঝাঁপ বর্ণ হ'ল কালি॥
অগ্রাণে নতুন ধান কৃষ্ণের সমান।
অবশ্য আসিবেন কৃষ্ণ করিবেন নবান[৬২]॥
পোষে পাষণ্ড শীত পরে প্রভুর গায়।
উঠিতে বসিতে সীতার অধিক রাত্রি যায়॥

৬১। ঘোমটা
৬২। নবান্ন

মাঘে মাধব করে মথুরা গমন।
দশদিকে দশ শূন্য শূন্য বৃন্দাবন ॥
চৈত্রে চাতক পাখী করে কলরব।
তোমার বাণী শুনে আমরা ধেয়ে এলাম সব ॥
বৈশাখে বিষম খরা কৃষ্ণ কদমতলে।
পাটবস্ত্র পরিধান বনমালা গলে ॥
জৈষ্ঠ্যে যমুনার জলে খেলেন বনমালী।
শ্যাম অঙ্গে দিতাম জল অঞ্জলি অঞ্জলি ॥
আইল আষাঢ় মাস বরষা সময়।
পক্ষী আদি দেখে সব বাসার সঞ্চয় ॥
আষাঢ়ে নবীন মেঘ উঠিল গগন ছাইয়ে।
শ্যামের চরণ কালো মেঘ রইলো দাঁড়িয়ে ॥
ভাদরে ভরিল নদী দুকূল পাথার।
উঠে যেতে করি মনে না জানি সাঁতার ॥
উড়ে যেতে করি মনে পক্ষ না দেয় বিধি।
এমন দশা করে গেল পিয়া গুননিধি ॥
শাওনে শয়নে ছিলেন শ্যামের মন্দিরে।
কে জানে যে এ হেন পিয়া যাইবে ছাড়িয়ে ॥

অথবা

আশ্বিনে অম্বিকাপূজা মেঘ মহিষের ঘটা।
কাত্তিক মাসে কালিপূজা ভাই দ্বিতীয়ার ফোঁটা ॥
অগ্রাহণ মাসে নবান্ন সে সরুধান কেটে।
পোষ মাসে বাউরী বাঁধা ঘরে ঘরে পিঠে ॥
মাঘ মাসে মাকড়ী সপ্তমী ছেলের হাতে খড়ি।
ফাগুন মাসে দোলযাত্রা ফাগের ছড়াছড়ি।
চৈত্রমাসে শিবের পূজা গাজন হয় ভারি।
বৈশাখ মাসে ধরম পূজা ঢাকের ছড়াছড়ি ॥
জৈষ্ঠ্য মাসে ষষ্ঠীপূজা ছেলের গলায় দড়ি।
শাওন মাসে শাকপালুনি পূজা নয় ভারি ॥
ভাদ্রমাসে নন্দোৎসব কাদায় গড়াগড়ি ॥
ঐ সময় চলে আরও তাল কাড়াকাড়ি।

তৃতীয় পর্ব

উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে বাউল, কবিগান, কীর্তন ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনার দাবী রাখে। বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক তত্ত্বাশ্রয়ী গানকে লোকসঙ্গীতের পদমর্য্যাদা দেওয়া কষ্টকর। কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর বা জাতির আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন বা সাধনপ্রক্রিয়া সেই গোষ্ঠী বা জাতির কাছে মহৎ ও অপরিহার্য্য হ'লেও এর কোন সার্ব্বজনীন আবেদন নেই। এই তত্ত্বকে কেন্দ্র করে যে গান সে গানের গূঢ়ার্থ উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। গানের ভাবের সাথে আত্মীয়তা স্থাপন করতে না পারলে প্রকৃত রসাস্বাদন সম্ভব নয়। গানের অন্তর্নিহিত ভাবটি উপলব্ধি করতে হ'লে তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করতে হয়। লোকসঙ্গীতের যারা শ্রোতা তারা সূক্ষ্ম রসতত্ত্ব বোঝে না। বোঝার চেষ্টাও করে না। সহজ সরল জীবনে চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে যে সুখ ও দুঃখ, আশা ও হতাশা তারই এক সামগ্রিক চিত্র লোকসঙ্গীতের উপজীব্য। উত্তর-রাঢ়ের গ্রামজীবনের যে কোন সামাজিক উৎসবে বা মেলাখেলায় লোকসঙ্গীতের সাথে তত্ত্ব বা পালাপ্রধান সঙ্গীতের এমন অনুপ্রবেশ ঘটেছে,—বৈচিত্র্যের দাবীতে পারস্পরিক গ্রহণ বর্জনের ভিত্তিতে ভাব ভাষা ও সুরের ক্ষেত্রে এমন সংমিশ্রণ ঘটেছে—শ্রোতার ক্ষেত্রেও রুচি ও মানসিকতার এমন পরিবর্তন ঘটেছে যে শুধুমাত্র তত্ত্বের আছিলায় এই জাতীয় গানকে লোকসঙ্গীতের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশাধিকার না দেওয়া অসঙ্গত। বিশেষ করে এই জনপদের লোকসংস্কৃতিতে, আচার-ব্যবহারে, ধ্যানধারণায় এ জাতীয় গানের অবদান অপরিসীম।

বস্তুতঃ-এ দেশের গ্রামজীবনের সংস্কৃতির উদারবিস্তৃত ক্ষেত্রে সকলেরই সমান

আনাগোনা। তাই লোকসঙ্গীতের প্রায় প্রতিটি শাখায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তত্ত্বকথা এসে পড়েছে। জোনাকী জ্বলা নিঝুম রাতে বারোয়ারীতলায় যে আসর, আর হ্যাজাক জ্বলা সামিয়ানার নীচে যে আসর—উভয় ক্ষেত্রেই শ্রোতাদের মধ্যে অন্ত্যজ শ্রেণী আর নিম্নমধ্যবিত্ত মধ্যবিত্তের যে সূক্ষ্ম সীমারেখা তা ক্রমে ক্রমে অপসৃত হচ্ছে। লোকসঙ্গীতও তার গণ্ডীবদ্ধ সীমারেখাকে উদারভাবে আরও বিস্তৃত করে ইতিহাসের প্রয়োজনে ও নির্দ্দেশে এই জাতীয় পল্লীগীতিকে স্বাঙ্গীকৃত করে নিচ্ছে। একথা সত্য—এ জাতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে উচ্চাঙ্গের ভাব, ভাষা ও সুরের ক্ষেত্রে যে নীতির অনুশাসন তা লোকসঙ্গীতের সহজ, স্বাভাবিক, শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল নয়। লোকসঙ্গীত কখনই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা তত্ত্বের প্রচারবাহক হ'তে পারে না। এতে পূর্ণ রসোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু এই গানের বহিরঙ্গ রূপ ও ভাব, গায়কের সুরেলা কণ্ঠ ও পরিবেশনভঙ্গী যখন লোকসঙ্গীতের মতই আন্তরিকতাপূর্ণ তখনই এই গান একটি আকর্ষণীয় পরিবেশ রচনায় সমর্থ হয়। তখনই এর আবেদন সার্ব্বজনীন হ'য়ে পড়ে। বাউল ফকিরের গানের তত্ত্ব তখন আর মুখ্য থাকে না সুর তত্ত্বকে ছাড়িয়ে এমন একটি পরিমণ্ডল রচনা করে যে শ্রোতৃবৃন্দ গানের বহিরঙ্গ রূপ, আঙ্গিক, সুর ইত্যাদি নিয়েই তৃপ্ত হয়। আর এ গান শুধু গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয় শহর বা শিল্পাঞ্চলেও প্রচারিত। এর কারণ সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে কোন উৎসবে, অনুষ্ঠানে ও আসরে গ্রামের ধারে, ঘরের প্রশস্ত আঙিনায়—কখনও বা গ্রাম্য দেবদেবীর পূজার্চ্চনায় ও মেলাখেলায় নিম্নসম্প্রদায়ের সাথেই সঙ্গীত ও লোকনৃত্য উপভোগ করে, উৎসাহ দেয়। বৃত্তিগত গানগুলি ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত গ্রামাঞ্চলের মধ্যবিত্ত এই লোকসঙ্গীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেনি। অথচ লোক-সংস্কৃতির অন্যান্য শাখায় যেমন ব্রতে, ছড়ায়, গীতিকায়, উপকথায় শুধু গ্রামাঞ্চল কেন শহরের নিম্নমধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পল্লীগীতির অন্যান্য শাখা—যেমন বাউল, কবিগান, যাত্রা, কীর্তন ইত্যাদিতে কিন্তু গায়ক ও শ্রোতা উভয় ক্ষেত্রেই নিম্নমধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্তের সক্রিয় অংশ আছে—আছে শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত মানসিকতা।

এই নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদেব শিক্ষা বা জীবিকার প্রয়োজনে শহরে বা শিল্পাঞ্চলে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে এসে ভীড় করেছে। এদের সাথে সাথে পল্লীগীতির কিছু কিছু শাখাপ্রশাখাও শহরের সাংস্কৃতিক

জীবনে প্রবেশ করেছে। শহরে বা নগরের পথে ঘাটে বা আসরে পটুয়া বা বেদে গান গাইছে এমন দৃশ্য দেখা যায় না। কিন্তু শহরের বা শিল্পাঞ্চলের বারোয়ারী পূজায় বা কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, ষ্টেশনের প্লাটফরমে, চলন্ত ট্রেনে বা রেস্তোরাঁয় বাউলগান বা কবিগান শোনা যায় স্বাধীনতা উত্তর বাঙলা দেশেও। অবশ্য শিল্পাঞ্চলে কখনও কখনও আদিরসাশ্রিত ঝুমুর গানও শোনা যায়। শহরাঞ্চলে এই জাতীয় পল্লীগীতির প্রসারতা লাভের কারণ প্রথমত নবতর সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় শহরের চাকুরীজীবী ও শিল্পাঞ্চলের মজুরের মাঝে যে শ্রেণীচেতনার উন্মেষ ঘটেছে—তা গ্রামের মানুষ ও তার সংস্কৃতিকে সহজভাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একটি উদার মানসিকতার সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয়ত—সিনেমা; থিয়েটার ইত্যাদির একঘেঁয়েমির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আগ্রহ ও অভিনবত্বের প্রতি মোহ। তৃতীয়ত—শহরাঞ্চলের সংস্কৃতির এলেকা সম্প্রসারণের জন্য পল্লীগীতিকে স্থায়ীকরণের প্রয়োজনীয়তা পুঁজিবাদী ও অবক্ষয়ী সমাজব্যবস্থায় শুধু বাঙলাদেশ কেন সমগ্র পৃথিবীর আগ্রহ। দেউলিয়া সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাই তাকে পল্লী তথা লোকসংস্কৃতির প্রাণপ্রবাহিনী ধারার দ্বারস্থ হতে হয়।

ব্যক্তিজীবনে যে হতাশা, হাহাকার তারই প্রকাশ সমাজে। কৃত্রিম আর কলুষিত আবহাওয়ার মাঝে বেঁচে থাকতেও আনন্দ আহ্লাদের প্রয়োজন। তাই পুঁজিবাদী সমাজের মানুষ যখনই সুযোগ পায় তখনই ফিরে আসে এই লোক-সংস্কৃতির মাঝে। শহরে সঙ্গীতের পাঁচমশেলী আসরে বা বেতারের সূচীতে যে পল্লীগীতি তাতে কখনও কখনও দর্শন বা তত্ত্বকথা এসে পড়লেও আখ্যান নেই বললেই চলে। কিন্তু কবিগান, যাত্রা, কীর্তন ইত্যাদিতে উপাখ্যানই মূলকথা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য বলেছেন যে লোকগীতিতে কোন কাহিনী থাকে না। এ কথা ঠিক নয়, তাই এবিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কারণ পটুয়া, লেটো, আলকাপ ইত্যাদিতে কাহিনীই মুখ্য উপজীব্য।

কীর্তনে, বৈষ্ণব জীবনদর্শনে এবং বাউল ফকিরের গানে যে তত্ত্বকথা তাও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। এজাতীয় সমস্ত গায়কগায়িকাদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে বর্তমানে যাঁরা গান করেন তাঁদের অধিকাংশই এ তত্ত্ববিশ্লেষণে সক্ষম নন, যদিও তাঁদের এই অক্ষমতা এই সঙ্গীতচর্চায় বা পরিবেশনে কোন রসহানি ঘটায় না। বৃত্তিনির্ভর সমাজব্যবস্থার ক্রমাবলুপ্তির সাথে সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুরুষানুক্রমিক সাধনা বা নিষ্ঠাচার

অনিবার্য্য কারণেই অন্তর্হিত। লোকসঙ্গীতের যে গুণ 'প্রত্যক্ষতা ও স্বাভাবিকতা, ভাবের ক্ষেত্রে এজাতীয় সঙ্গীতে তা অনুপস্থিত কিন্তু সুরের ক্ষেত্রে 'প্রত্যক্ষতা' আছে বলেই আমার বিশ্বাস, যদিও সেখানে স্বাভাবিকতা বা 'traditional' ভাবটি নেই। এছাড়া 'সুরেলা কণ্ঠস্বর ও স্মৃতিশক্তি'ই যদি লোকসঙ্গীতের অন্যতম সম্পদ হয় তাহলেও বাউল, কবিগান, কীর্তন বা শহরাঞ্চলে গীত পল্লীগীতিতে সুরেলা কণ্ঠস্বরের দাবী অনায়াসেই করা যায়। যদিও স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন এখানে খুবই কম। স্বরচিত গান (বাউল, কবিগান) বা লিখিত গানের পরিবেশনা (বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালি ইত্যাদি)—এর ক্ষেত্রে চর্চা ও প্রতিভার বিকাশ হয়।

লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞার মধ্যে তত্ত্বের ও আখ্যানের যে গণ্ডী টানা হয়েছে তা কতখানি গ্রহণযোগ্য ভবিষ্যতের গবেষকরাই তা' স্থির করবেন। কারণ এ প্রসঙ্গে অনেক বিতর্কমূলক বিষয় এসে পড়ে। আমাদের সংগৃহীত লোকসঙ্গীতে কখনও কখনও তত্ত্বের প্রকাশ (ঝুমুর, লেটো, বোলান) আবার কখনও উপাখ্যানের (পটুয়া, আলকাপ) প্রকাশ হয়ে পড়েছে। শুধু তত্ত্ব বা আখ্যানের অজুহাতে লোকসঙ্গীত সেগুলিকে বর্জন করেনি। এছাড়া প্রতিটি বিশেষ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশেষ একটি traditional সুর আছে। পটুয়া যে সুরে গান গায়, ভাদুগান সে সুরে শোনা যায় না। তাহলে বাউল, কবিগান, কীর্তন ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে একটি নিজস্ব সুর আছে সেই দাবীতেও তারা লোকসঙ্গীতের অংশীদারত্বের দাবী করতে পারে। মূলত তত্ত্ব বা দর্শন প্রচার বা আখ্যান শোনানোর উদ্দেশ্যে এজাতীয় পল্লীগীতি কোন এক সময়ে রচিত হলেও আজকের যান্ত্রিকসভ্যতায় খেটে খাওয়া মানুষের জীবিকার স্বল্পকালীন অবসরে সেই তত্ত্ববিশ্লেষণ গৌণ হয়ে পড়েছে কি গ্রাম্য কি শহুরে উভয় শ্রেণীর মানুষের কাছেই। তা ছাড়া তত্ত্বগীতিতে গুরুবাদ মুখ্য হলেও আজকাল তেমন গুরুই বা জন্মাছে কৈ? তেমন গানই বা লেখা হচ্ছে কোথায়? শুধু সুরের ক্ষেত্রে প্রবহমানতা বজায় রেখে কয়েক দশক বা এক দুই শতক পূর্বের লিখিত গানগুলিই পথেঘাটে শোনা যাচ্ছে। সমসাময়িকতার চাপে যে গান লেখা হচ্ছে—তাতে গূঢ়তত্ত্ব কোথায়? সুতরাং অতীতে কোন এক সময়ে কোন এক খ্যাত বা অখ্যাতজনের গানই পুরুষ হতে পুরুষান্তরে প্রচারিত হচ্ছে।

লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও গীতিকার একজন। অবশ্য পার্থক্য এই যে লোক-সঙ্গীতে গায়কের নামের উল্লেখ থাকে না এবং এর লিখিত রূপ নেই বলেই শ্রুতি বা স্মৃতির পরিমার্জনায় গান পরিবর্তিত হয়েই চলেছে। শহর বা নগরের সংস্কৃতি

তার নিঃসীম মুনাফা-লোলুপতা আর কৃত্রিম জৌলুষের মাঝে এই পল্লীগীতিকে গ্রহণ বর্জনের ভিত্তিতে স্বাঙ্গীকরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে পল্লীসমাজেও লোকসংস্কৃতির মাঝে শহর বা নগরসংস্কৃতির প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানেও সেই গ্রহণ বর্জনের ভিত্তিতে স্বাঙ্গীকরণের চেষ্টা।

পল্লীঅঞ্চলে পল্লীগীতির ধারাবাহিক বা লোকসংস্কৃতিতে শহুরে-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ এসম্পর্কে আলোচনা করতে হলে ভূমিব্যবস্থা ও অর্থনীতির পল্লীসমাজের শ্রেণীবিন্যাস ও ক্রমবিবর্তনের ধারাটিও অনুধাবন করা প্রয়োজন। গ্রামে যখন জমিদারী প্রথা চালু ছিল তখন পারিবারিক বা ধর্মীয় উৎসবে যাত্রা বা পালাগান, কবিগান বা কীর্তন-এর আসর জমিয়ে আনন্দ উপভোগ করা হত। এতে প্রজাদেব কাছে জমিদারদের আত্মপ্রচারের মোহ কিছুটা কাজ করেছে একথা সত্য কিন্তু এই আসবে অন্দরমহলের মহিলারা গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত বা সর্বহারার দলও আনন্দলাভ করতো। এ জাতীয় পল্লীগীতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মীয় উপাখ্যান পরিবেশিত হত। মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকাদের ক্রিয়াকলাপ, দেবদেবীর লীলাবৈচিত্র্য সুরাসুরের দ্বন্দ্ব এরই মাঝে আদর্শবাদ, মানবিক মূল্যবোধকে যেমন তুলে ধরা হত, তেমন আধিদৈবিক, আধিভৌতিক কার্য্যধারা, জন্মান্তরবাদ, পরলোক, অদৃষ্টবাদ—সর্বোপরি জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঈশ্বরের কাছে নিঃসর্ত আত্মসমর্পণ—এগুলিও সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে। মধ্যযুগীয় স্তরে, সামন্ততন্ত্রে বা পরবর্তী স্তরে জমিদারতন্ত্রে গ্রামজীবনের সর্বক্ষেত্রে যে ধর্মান্ধতা বা কুসংস্কার জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল তাকে তৎকালীন যুগে সরাবার কোন প্রচেষ্টা তো ছিলই না বরং পূজা, উৎসব ও লোকসংস্কৃতির মাঝে যে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টা সেখানেও শুধু অদৃষ্টবাদ ও আত্মসন্তুষ্টির সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখার ইচ্ছাই কাজ করেছে। অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতনতা ও অধিকার রক্ষা ও অর্জনের জন্য যে আত্মশক্তিতে আস্থা তার কোন ইঙ্গিত লোকসংস্কৃতির তৎকালীন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ইংরেজশাসনের পর হতে বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দী হতে ভাবার ক্ষেত্রে বাঙলাদেশে যে নতুন দিগন্তের সূচনা হল সেখানেও কিন্তু পল্লীর এই অন্ত্যজশ্রেণীকে বঞ্চিত করে রাখা হল। অবশ্য একথা ঠিক গ্রাম্য দেবদেবীর পূজার্চনায়, পারিবারিক উৎসবে বা মেলা-খেলায় লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে নিম্নসম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকা সর্বকালেই স্বীকৃত।

জমিদারীপ্রথা অবলুপ্তির পর গ্রামজীবনেও পুঁজিবাদের বিকাশ দেখা দিয়েছে। গ্রামের বৃত্তিনির্ভর পরিবার যান্ত্রিকসভ্যতার চাপে হয় শহর মুখাপেক্ষী হয়েছে

নতুবা আরও অধিক পরিমাণে কৃষিনির্ভর হয়েছে। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেল ঠিকই কিন্তু ভূমির উপর চাপ সৃষ্টি হল। কৃষিপণ্য বিনিময় করে শহরের পুঁজিকে ক্রমে ক্রমে গ্রামের জোতদারেরা সম্ভবমত কুক্ষিগত করার চেষ্টা সুরু করলেন। অথচ গ্রামীন সমাজের বা সংস্কৃতির প্রতি এদের কোন দায় থাকলো না এদিকে স্বাধীনতা-উত্তর রাষ্ট্রের কাঠমো পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইপ্সিত পরিবর্ত্তন দেখা না দিলেও কিছু পুনর্বিন্যাস দেখা দিল যা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থারই অনিবার্য্য পরিণতি। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই পুঁজিবাদের প্রভাব দুরতিক্রম্য। এ সম্পর্কে শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত ১৯৬৮ সনে তিরুচিরাপাল্লীতে অনুষ্ঠিত তামিলনাড়ু শিল্পসাহিত্য সম্মেলনের লোকসাহিত্য বিভাগের সভাপতি রূপে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ঐ বক্তব্যটি "ফোকলোর" পত্রিকার জুলাই, ১৯৬৮তে ৩৬০—৩৬৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে দীনতা বজায় রেখে অশ্লীলতার দায়ে লোক-সংস্কৃতিকে দূরে সরিয়ে রাখার একটি অপপ্রয়াস চলেছে। এছাড়া গনচেতনার উন্মেষ বা শ্রেণী-সংঘর্ষের কথা যাতে লোকসংস্কৃতি তথা পল্লীগীতিকে স্পর্শ না করে সেইজন্য আজও অতি সাবধানে ধর্মীয় আচারের সুদৃশ্য আবরণকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

ইতিমধ্যে পূর্ববাঙলার অগণিত পরিবারের উপস্থিতি এদেশের শহরাঞ্চলে এমনকি, গ্রামজীবনের সংস্কৃতিতে একটি মধ্যবিত্ত মানাসকতা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। ছিন্নমূল পরিবার তাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে যেমন ক্ষেতেখামারে এদেশের মানুষের সাথে একাত্মতা স্থাপন করেছে তেমনি তাদের সযত্নপুষ্ট সংস্কৃতিকেও এদেশের সংস্কৃতির সাথে স্বাঙ্গীকরণের চেষ্টা চলিয়াছে। অবিভক্ত বাঙলার পল্লীসংস্কৃতিতে যে মূলগত ও ভাবগত ঐক্য তা এই স্বাঙ্গীকরণকে ত্বরান্বিত করেছে। এছাড়া পথঘাট সংস্কার ও যানবাহনের সুযোগবৃদ্ধির ফলে গ্রামে ও শহরের ক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্পের কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যের যে ব্যবধান তা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। নগরজীবনের সিনেমা, থিয়েটার-এর চটুল গান, রঙ্গবিলাস গ্রামিক জনসাধারণের শ্রুতি ও রুচিকে অনেকখানি গ্রাস করেছে। সিনেমার গানের অনন্য আকর্ষণ পল্লীগীতিকে আকৃষ্ট করেছে।

এখানে গবেষক শ্রীঅরুণ রায়ের লোকায়নের সংজ্ঞাটি তুলে দেওয়া যেতে পারে—'যে সজীব উপাদানসমূহ মানবসভ্যতার উষাকালে যৌথ-প্রয়াসে সর্ব-জনগ্রাহ্য উপসৌধগুলির ভিত্তিভূমি রচনায় সহায়তা করেছিল এবং শ্রেণীভিত্তিক সমাজ অতিক্রম করে এবং নবঅভিজ্ঞতায় বলীয়ান হয়ে ভবিষ্যতের এক উচ্চতর

সর্ব্বজনগ্রাহ্য সাংস্কৃতিক উপসৌধ গড়ার চালিকা-শক্তিরূপে আমাদের যুগের সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারে সঞ্চয়রূপে দেখা দেয় তাকেই লোকায়ন বলে।' গ্রামোফোন, মাইক, রেডিও ইত্যাদির কল্যাণে চলচ্চিত্রসঙ্গীতের প্রচারও সর্বাধিক। কিন্তু বিপরীতপক্ষে একথাও সত্য যে সিনেমার 'পপুলার' গানের মাঝে ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর লোকসঙ্গীতের সুরের সংমিশ্রণ ঘটেছে। সুরকাররা দেশবিদেশের লোকসঙ্গীতের মনমাতানো চিত্তজয়ী সুরের সংমিশ্রণ করে এক নতুন সুরের সৃষ্টি করে চলেছেন।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে শহর ও গ্রামের মানুষের মাঝে পরস্পর নির্ভরশীলতাই পল্লীগীতি ও শহরের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পারস্পরিক লেনদেনের মূল কারণ। তাই লোকগীতি যা এখনও গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত বা অন্ত্যজশ্রেণীর মধ্যেই মূলত সীমাবদ্ধ—শহরের গীতির প্রভাব ও সমসাময়িক গণচেতনাকে এর ভাবে, ভাষায় ও সুরে রূপান্তরকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে ঠিক তেমনি শহরের সাংস্কৃতিক জীবনেও পল্লীগীতি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জমির ক্ষুধা বা ফসলের কামনাকে অব্যাহত রেখেও শহরের শ্রমজীবী মানুষের সাথে গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের যেদিন ইতিহাসের প্রয়োজনে পূর্ণ একাত্মতা স্থাপিত হ'বে সেদিন শহরের সংস্কৃতির মাঝে যে চটুলতা, যে যৌনপ্রবণতা আছে তা' ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে পল্লীগীতি ও পরে লোকগীতির সাথে মিলেমিশে এক নবতর লোকগীতির সৃষ্টি করবে বলেই বিশ্বাস যা শহর বা গ্রামের সীমারেখায় আবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর জনসমাজের সর্বাত্মক জাগরণের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। উপরিউক্ত আলোচনার নিরিখে নিয়ে লোকসঙ্গীতের আরও কয়েকটি শাখার বা ধারার কথা আলোচনা করা সম্ভব। যেমন বাউল।

বাউল

উত্তর-রাঢ়ের পথে ঘাটে, গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে, গাছের ছায়ায়, মাটির দাওয়ায়, আশ্রমে আর আস্তানায়, রেলের কামরায়, চায়ের দোকানে সর্বত্রই বাউলের দেখা মিলবে। মাথায় চূড়া করা চুল, পরণে গেরুয়া আলখাল্লা, আর হাতে একতারা। কখনও বা একা কখনও সঙ্গী সাথী নিয়ে। গান শুনতে ইচ্ছা করে বললেই গাইবে। খুব পরিপাটি করে আশ্রমটি সাজিয়ে রাখে। বাউলগীতির পুরাতনী ভাবধারার প্রতিনিধি ৺নবনী দাস আর নব্যধারার শ্রীপূর্ণদাস এই জনপদের মানুষ। মাথায় সুদীর্ঘ এক পাগড়ী, রঙবেরঙের ছিট দিয়ে তৈরী এক

বিচিত্র বর্ণের আলখাল্লা পরনে, সদাহাস্যময় সেই ক্ষ্যাপা বাউল ৺নবনী দাস যখন পায়ে নুপুর পরে গুরুভার দেহ নিয়ে ঘুরে ফিরে তালে তালে নৃত্য করতেন আর দুহাত প্রসারিত করে যখন গান জুড়ে দিতেন তখন তা ছিলএক অপূর্ব দৃশ্য।

সে এক রসিক পাগলা
বাধালে গোল
ত্যাখ সে নদীয়ায়।

সারা মুখে তাঁর হাসি, চোখ দুটিতে খুসির জোয়ার। সমস্ত অনুভূতিতে সঙ্গীতের পুলক মাখানো। কোথাও তত্ত্বের রহস্যময়তা নেই—নেই সঙ্গীতাভিমানীর আত্মসর্বস্বতা। সবে মিলিয়ে এক বিচিত্র পরিবেশ। পারিবারিক বা সামাজিক উৎসবে, সম্মেলনে বা অনুষ্ঠানে, পূজার্চনায় বা মেলাখেলায় সর্বত্রই বাউলের ডাক আসে। পৌষ সংক্রান্তির দিন জয়দেবের মেলায় দেশের যত বাউল এসে সমবেত হয় জয়দেবে। সারা বছরের সংগ্রহ উজাড় করে দেয় ওরা সারা রাত্রি ধরে। অপূর্ব সে দৃশ্য।

বাউল ধর্মের উপাদান বা এর তত্ত্ব সম্পর্কে ডঃ উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর "বাঙলার বাউল" গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বাউল গীতি পাঠের পটভূমিকা রচনা করার জন্য তাঁর সেই গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশ চুম্বক হিসাবে নিম্নে দেওয়া হল—

বাউল ধর্মের উপাদান—১। দেববহির্ভূত ধর্ম। ২। গুরুবাদ। ৩। স্থূল মানবদেহের গৌরব। ৪। মনের মানুষ। ৫। রূপস্বরূপতত্ত্ব।

বাউলের আচার 'রাগের আচার'—'বেদের আচার' নয়। মদনের পঞ্চবাণে, মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন আর সম্মোহনে সংসারে যাবতীয় কামঘটিত ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে। বাউলের সাধনা—কামের মধ্য হতে প্রেমকে নিষ্কাশন করা—কামের বিষ নাশ করে প্রেমের অমৃতত্ব লাভ করা। বাউলের বাণ প্রয়োগ কৌশল রসরতির বিসর্জনে নয়—অটল প্রতিষ্ঠায়; নিম্নগামী করায় নয় ঊর্ধ্বগামী করায়। প্রবৃত্তির মাঝেই নিবৃত্তি। তন্ত্র সাধনা ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরোধী। হিন্দুতন্ত্র গ্রন্থে বেদের নিন্দা আছে, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়ারা বেদ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মকে ব্যঙ্গ করেছে সুফী ধর্মেও আনুষ্ঠানিক মুসলমান ধর্ম শরীয়তকে মূল্যহীন ও মারফত পন্থাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। যে ধর্মগুলির সমন্বয়ে বাউল ধর্মের উদ্ভব সেগুলির কোনটিই বৈদিক ধর্মকে মানে নি।

তান্ত্রিক ধর্মের ভিত্তিই ক্রিয়া সাধনাই এর মূলরূপ। এই সাধনাংশে যে

সমস্ত গূঢ় পদ্ধতি, যোগসাধনা প্রভৃতি আছে—তাতে গুরুর উপদেশ ও সাহচর্য অপরিহার্য। বাউল গুরুকে (১) মানবগুরুরূপে (২) পরমতত্ত্ব বা ভগবানরূপে দেখে। মানবগুরু সেই পরমগুরুরই প্রতিনিধি। গুরু বা মুরশিদ এ জগতে পরম সম্পদ এবং স্বয়ং ভগবান গুরুরূপে শিষ্যকে সাধনপথে পরিচালিত করছে বলেই বাউলদের বিশ্বাস। দেহের সারবস্তু বিন্দু মানুষের পরম সম্পদ। এই বিন্দুই 'শ্রীগুরু' বা ভগবানের স্বরূপ। আর এই বিন্দু রক্ষাই বাউল সাধনার মূল ভিত্তি। ভগবানের স্বরূপই গুরুতত্ত্ব। স্বরূপে তাঁর তিনটি অংশ—একটি ভোক্তা পুরুষরূপে; আর একটি শক্তি ভোগ্যরূপে; অপরটি উভয়ের মিলিত মহানন্দ শিহরিত সম্মিলিত অবস্থা।

মানবদেহের মধ্যেই মূলতত্ত্ব—আত্মা বা ভগবানের বাস। মানবদেহাশ্রিত সাধনাই তাঁদের বর্তমান। এর মাঝেই ব্রহ্মাণ্ডকে কল্পনা করা হয়েছে। এর মাঝেই পরম পুরুষ বা 'মনের মানুষ'। দেহ হতেই পুরুষ ও প্রকৃতির বিকাশ ঘটে।

মনের মানুষ প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়াদের মত মানুষ তিন প্রকার—সংস্কার, অযোনি ও সহজ। সংস্কার—মানুষ সংসারের সাধারণ জন্ম মৃত্যুর অধীন মানুষ; অযোনি-মানুষ গোলকবিহারী বৈকুণ্ঠপতি; আর সহজ-মানুষ গোলকের উপর বৃন্দাবনেশ্বরী রাধাসহ সহজানন্দ রসে বিরাজ করে। রূপরসতত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে—রূপ বলতে বাইরের একটি আকারকে বোঝায়—আর এই রূপকে আশ্রয় করে এই রূপের অভ্যন্তরে এর যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান তাকেই স্বরূপ বলা হয়। বাউলের সাধনা মূলত এই রূপ হতে স্বরূপে উত্তীর্ণ হওয়া।

এই প্রসঙ্গে ৺নবনী দাসের সংগ্রহ হতে কয়েকটি লাইন তুলে দেওয়া হল।[৬৩] ভবিষ্যৎ গবেষকদের স্বার্থে পদগুলো যেমন পাওয়া গেছে ঠিক তেমন-ভাবেই উদ্ধৃত করছি—

নিগুনং পরমং ব্রহ্মা সর্বকারণং কারণ।

—পদ—

একদিন নিরঞ্জনের হইল মন সৃষ্টি করিতে বাঞ্ছা হইলে তখন তেজরূপা ব্রাহ্মমূর্ত্তি প্রকাশ মনে হইয়া সং চিং আনন্দভাব তখন ধরিল। আত্মা হইতে আ অ শক্তি প্রকাশ করিয়া সদা কাল চিত্ত তার আহ্লাদিত হইয়া দেখিয়া শক্তির

৬৩। ৺নবনী দাসের নিজের লেখা ও সংগৃহীত কিছু গান আমার মামা ডাঃ কালিপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পেয়েছি।

রূপ গোবিন্দ পুরুষ বিলাস করনেতে মন স্পর্শে আকর্ষণ করে রমন বিলাস মাঝে পুলক অন্তরে। বিলাসের তিন ভাব আনন্দ উল্লাস। হরেকৃষ্ণ রামনাম হইল প্রকাশ। এই তিন নাম হইতে হরির উদয়। তিন ভাবে তিন নাম কর্ম জগতে কবয়। সৎ চিৎ আনন্দ একই স্বরূপ। এক কৃষ্ণ হইয়াছেন দেখ তিনরূপে। সৎ অংশে শ্রীনন্দের নন্দন। আনন্দ অংশে হ্লাদিনী শ্রীরাধিকা—

এই প্রকৃতি কৃষ্ণ জগতের মন করে আকর্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণের মন শ্রীরাধিকাতে হ'য়েছে হরণ॥
উভয়ের মন খোল মায়া নিয়াছেন অনুক্ষণ।
এর সাথেল নস্বয়ং হারি বলি,
আ অ তত্ত্ব ও মহতত্ত্বের জন্ম।
প্রকৃতি পুরুষ রাধাকৃষ্ণ দুই জন,
সে কর্যন ইচ্ছা মাতা পিতা রূপে স্থিতি।
ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় পুরুষ॥
প্রকৃতি গ্রহাদিও রাজা হয়ে যাহার দেহে রয়।
সেই যে প্রকৃতি কিন্তু জানিও নিও নিশ্চয়॥
দৈত্য গুরু যাহার দেহে করে অধিকার।
নিশ্চয় জানিও সেই পুরুষ মূলাধার॥
রজের গরজে পতির গতি রাখা দায়,
কুণ্ডলিনীর অনিলে নিক্ষা ফলে বান্দা।
বারায় রাখিছ উড়িদ নাম ধরিলা কন্দর্প,
এই তো হইল মহতত্ত্বের আকার॥

উপরোক্ত উদ্ধৃতির অর্থ সর্বক্ষেত্রে ঠিক পরিস্ফুট নয়, তবে একটি সামগ্রিক ভাব উপলব্ধি করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন বশীকরণ ও সাধনক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন শ্লোকের উল্লেখ আছে। নীচে দুটি উদাহরণ দেওয়া গেল—

দেহের জরণ

চল চল মহারস মল উর্দ্ধনালে
চল চল মহারস ব্রহ্মার দুয়ারে
ভাটিনাল মহারস উজানেতে ধায়
নালিখুর মহারস তালা বন্ধ হয়
দোহাই শ্রীরূপ।

দেহবন্ধ

হা হু হে গুরু লক্ষণের রতি উর্দ্ধ, করেছে রতিবন্ধ
পিঙ্গা শমেশ্বর উল্টা তারপর। যার তীর তার শির।

সভার লোককে বাধ্য করার জন্য সভায় দাঁড়িয়ে তিনবার নিম্নোক্ত শ্লোক আওড়াতে হয়—

লক্ষণ গেল রাজ দরবারে,
রাজদরবারে করিল পেশা।
দশজনা দেখে লক্ষণকে দারুণ খাসা॥
যেমন গাই-এ লাগে বাছুর,
তেমন জলে তো থাকে মাছ।
ওমনি লাগে দশ জনা লক্ষণের প্যাঁচ॥
লক্ষণকে ছেড়ে অন্যের দিকে চায়।
দোহাই লাগে কামাখ্যা মার মাথা খায়॥

৺নবনী দাসের বাউল গানের আরও কিছু উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া হল :

১। মনে লাগে গৌউর আমার ভুলি বল কি করে।
সদাই গৌউর, গৌউর বলে প্রাণ কাঁদে হু হু করে॥
ঐ আমি কেন গেলাম সুরধনী, হেরে এলাম গৌউর মনি।
সেই অবধি কিছুই না জানি রইতে নারি পাপ ঘরে॥
মল্লিকার ঐ মালাগলে, ওগো ত্রিলোক চন্দন ভালে।
গৌউর প্রাণপাখী, উড়ে বসলো কার ঘরে॥
হৃদয় পিঞ্জরে ছিল, শিকলি কেটে পালিয়ে গেল।
সব খাঁচা পড়ে রহিল, গেলরে অনাথ করে॥
ওরে কহে দীন নবনী বাউলে এমনি আমার কপাল মন্দ
পাখীর নামটি প্রাণগোবিন্দ রাখতাম হৃদয় মন্দিরে।

২। দুই সতীনের ঝগড়া করে যেন ডুবাইও না আমারে।
চিরদিন কি থাকতে হবে তোদের কথায় চুপ করে॥
যে ঘরের মালিক দুইজনা তাদের কাজের ঠিক থাকে না।
এমনি হরির বিবেচনা, সোনা দেয় কানার ঘরে॥
কুমন্ত্রনের পুত্র ছয় ছ'টায় ঘরে ঘরে লাগিয়ে লেটা।
ধর্ম্মের পথে দিয়ে কাঁটা, ডাঙ্গাতে ডুবে মরে॥

ভাঙা ঘরের চাঁদের আলো, যে দিন যায় মোর সে দিন ভালো।
নবনী দাস ক্ষেপা বলে মিটল না আমার ঘরে ॥

৩। মুজরী বানাইতে পার, ডাকাতের এক দল কর।
ভক্তির ঘরে চাবি মেরে, ধর্ম্মের ঘর আগে মার ॥
ভোলানাথের সঞ্চিত ধন, শ্যামা মায়ের রাঙা চরণ।
করবি যদি হরিসাধন, দিনে ডাকাতি কর ॥
ছয়জনে চলে এক পথেতে তারা ধর্ম্মের ঘরে সিঁধ কাটিতে।
অমূল্য ধন আছে তাতে যে যত লুটিতে পার ॥
মায়া থাকতে হয় না চুরি যেখানে যায় যপ পরি।
মায়ার গলে লাগিয়ে ছুরি, হরিনাম সাধন কর ॥
নবনী দাস কয় বেলা গেল চুরি করা সাজতে হল।
চুরি করা বিদ্যা ভাল যদি ধরা না পড় ॥

সাজান গোষ্ঠ

সাজায়ে দে যশোদে মা তোর নীল রতনে।
মা গো হ'য়েছে অনেক বেলা চেয়ে দেখ মা গগনে ॥
আমার ভাই কানাইকে লয়ে আয় বলে বিন্দে খেলা খেলিব।
ক্ষুধা পেলে খেতে পাবো সেই যে গহন কাননে ॥
ভাই কানাইকে করবো রাজা আমরা সবে হব প্রজা।
দোষী জেনে দিব সাজা সত্যেরি করি পালনে ॥
মোদের রাজ্য পাট কদম্বতলা হস্তি ঘোড়া ডালপালা।
শিরে ছত্র ধরেন অবলা দাস বলাই রহিল তার চরণে॥

মনশিক্ষা

শুন মন রে আমার কথা শোন, এখন তুই বুঝে চল।
গুরু কৃষ্ণ ভুলে কাল কবলে, কেন যাবি চলে রসাতল ॥
যা গেছে তা গেছে চলে, যা আছে তাই লও সামলে।
পুষ্প মালি যতন করলে, অবশ্য ফলিবে ফল ॥
দৈব অপরাধকীটে ভক্তিলতা দিল কেটে।
উপশাখা ফেল ছেঁটে মূল ঢাল কৃপাসিন্ধু জল ॥

গোড়া কেটে আগায় জল, সিঞ্চিলে না ফলিবে ফল।
মদন রসে হ'য়ে বিহ্বল হারাইলি বিদ্যাবুদ্ধি বল॥
গোঁসাই গুরু চাঁদ কয় মূলশাখা বাড়তে দেয় না উপশাখা।
মূল বীজ না করে রক্ষা, রাধাশ্যাম রে কর্ম্মফল॥

মানসিক আক্ষেপ

এমন দুর্লভ মানব জনম পেয়ে হরি না ভজিয়ে।
আসর মজিয়ে যা ব'লে এলাম, গেলাম ভুলিয়ে॥
ঢাকা হইতে যেদিন হয়েছিল আসা।
বলেছিলাম পূজিব হরি হইয়া খোলসা॥
এখন রংপুরের তামাসা দেখে হ'ল নেশা।
সেই হ'তে এই দুর্দ্দশা, নিল খেরিয়ে॥
নবদ্বীপ হইতে যে পুঁজি আনিলাম।
দেবগ্রামে তোলা দিতে সকলি হারালাম॥
এখন বিক্রমপুরের হাট কি দিয়ে করিব বাট।
দিবানিশি ঐ ভাবনা ম'লাম ভাবিয়ে॥
গোউর হরি বলে শোন রে পাপমতি।
স্বভাবকে শলা করে করেছ এ দুর্গতি॥
বলি বিনয় বচনে শোন রে পাপ মন।
স্বভাব তেজে গোউর চরণ, ধর জড়ায়ে॥

দেহতত্ত্ব

১। দিল দরিয়ার মাঝেতে উঠেছে আজব কারখানা।
ডুবলে পরে রত্ন মিলে নইলে রত্ন মিলবে না॥
ধারের বাগান র'য়েছে নানা জাতি ফুল ধরেছে।
ফুলের সৌরভেতে জগৎ মেতেছে আমার নাসা মাতলো না॥
চৌদ্দ ভুবন তরীখানা, ছয়জনা তায় খে' টানিছে।
হাল ধরেছে একজনা॥
তিনদিকে কমল ফুটেছে—তাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব রয়েছে।
অনুরাগে যে ডুবেছে—সেই তো দিলের খবর করেছে॥
সেই তো মনে ঠিক দিয়েছে—সে করেছে হরি সাধনা॥

২। তিন গর্ভে আছে এক ছেলে, ছেলে সবাইকে কয় মনের কথা।
ছেলে আমায় কয় না দিল খুলে ॥
যাদের মোটা নজর হয়, ছেলে পলকে হারায়।
আর সরু নজর হ'লে ছেলে তারাই দেখতে পায় ॥
ছেলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তীক্ষ্ণ কথা তীক্ষ্ণ নয়নে মেলে,
আছে তিনজনা নারী অতি পরমা সুন্দরী,
যেমন ছেলে, তেমনি মাথা গঠন ফকিরী।
বিনা বাপের ছেলে পয়দা, বিনা বীজে বিনা ফলে,
মদন শা ফকিরে বলে ধরবো ধরবো মনে করি।
ভজন সাধন ছেড়ে দিয়ে ধরে ছেলের পায়।
ধরবো ধরবো মনে করি ইচ্ছা হয় করি কোলে ॥

প্রভাতী

ত্যজি ঘুমঘোর, উঠ মন চোর, নিশি হল ভোর উঠ রাই।
যাও কোমল আঁখি, যাও বিধুমুখী, ডাকিতেছে পাখী ॥
আর রাত্রি নাই। সুবাসিত কর্পূর জলে ধুয়ে বদনের বিন্দু।
যাও ধীরে ধীরে যশোদা মন্দিরে,
যাও ধীরে ধীরে যশোদা মন্দিরে।
নন্দকুলে রাইচন্দ্র, রতিবিলাসিত মুখ বসনে ঝাঁপায়ে।
যাও যাও চুপে ফেলি পা, আছে দারুণ সন্ধানী ননদিনী,
ঘরে বাঘিনী ডরে কাঁপে গা।

লীলাতত্ত্ব—সখির উক্তি

কাল যেখানে ছিলে হে নাগর, সেইখানেতে যাও না চলে।
রাধার কুঞ্জে গেলে, সাধের চন্দ্রাবলী উঠবে জ্বলে ॥
ছিলে চন্দ্রাবলীর ঘরে, উঠে এলে ঘুমের ঘোরে।
আঁখি ঢুলুঢুলু করে দেখো হে শ্যাম পড়বে ঢ'লে ॥
রাগের বালিশ মাথায় ল'য়ে, রাইধনী আছে ঘুমায়ে।
এখন কিজন্য এখানে এলে, তোমায় দেখে অঙ্গ জ্বলে ॥
যেমন তোমার ভালবাসা, ব্যাধের ঘরে হরিণ পোষা।

চাষ করছে নতুন চাষা, কানাই যেমন পাশা খেলে ।
মিছে কর ডাকাডাকি, তোমার প্রেমে ফাঁকা ফাঁকি ॥
অন্তিমে দিও না ফাঁকি, কাঙ্গাল অধর দাস বলে ।
চাঁচর কেশ ছিন্নভিন্ন, ভালে সিন্দুরের চিহ্ন ॥
বদনখানি দেখতে শূন্য ভাবে কি ভাবিছ মনে ।

রাধার উক্তি

১। যা যা সখি, যা ফিরে যা আর যাবো না পাপ ঘরে ।
বারে বারে কৃষ্ণ নিন্দা সখি সই বল কেমন করে ?
গোকুলের গোপীসকলে কে না যায় যমুনার জলে ?
আমি যখন জলে আসি ঢাক বাজায়ে গোল করে ॥
ননদিনী বাক্যরসী পাঁজর কেটে হৃদে বসি,
ভাঙ্গলো আমার কূলকলসী শ্যাম কলঙ্ক সায়রে ।
ননদিনী ইহার বলে যারি রাধা তারি হ'ল,
ক্ষেপা ব'লে হায় কি হ'ল, কি হ'ল এসে ভব সংসারে ।

২। প্রাণ কাঁদে যার তরে তারে, কোথায় পাবো গো দেখা ।
কোথায় থাকে ধাম জানি না, ও তার নাম শুনেছি প্রেমমাখা ॥
কত ডাকি উত্তর পাই না, কত কাঁদি দেখা দেয় না ।
পাছু পাছু বেড়াই ঘুরে স্বভাবটি তার লুকিয়ে থাকা ॥
তুমি হে অনাথের বন্ধু, অপার করুণার সিন্ধু ।
নিদেনকালে পরম বন্ধু, জীবনে মরণে সখা ॥
অনেকদিন দেখি নাই তারে, দেখি দেখি ইচ্ছা করে ।
ভালবেসে দেয় না দেখা, আছে আশে আশায় থাকা ॥
গোঁসাই বলে অনন্তরে দেখা পেলে রাখবি ধরে ।
এই নিশানা বলে দি তোরে তার বরণ কালো গঠন বাঁকা ॥

কৃষ্ণতত্ত্ব

বহু পূণ্যফলে কৃষ্ণ মিলে ও বিনোদিনী, ও বিনোদিনী, ও বিনোদিনী ।
এখন যায় মানে মান, তার অপমান মানিনী; মান করলি মানিনী ॥
মানে ছাই পড়ুক রাই জনমের মত ও গরবিনী ।

একদিন পেয়েছে রতন করলি না যতন, হেলায় রতন হারাইলি ধনি।
ঐ রাঙ্গাচরণ করি হে স্মরণ সেই কুব্জারাণী ।।
একদিন বিনা যন্ত্রে গায় সরস্বতীর কৃপায় মুখে,
ভজ ত্রিশূল শূলপানি, সেই রাঙ্গা চরণ করি হে স্মরণ, সেই কুব্জারাণী।
গোঁসাই ক্ষেপা চাঁদ কয় ওহে দয়াময় দিও চরণ দুখানি।

নিমাই প্রসঙ্গ

প্রাণের নিমাই, ছেড়ে কোথা গেলিরে? কাঁদায়ে জননী।
গৌর গুণমণি, উদাসিনী কেন হলিরে ॥
কাল নিশিতে ছিলাম, নিদ্রাঘোরে শুনেছিলাম আধ বুলিরে ॥
নিমাই যাইবার কালে ভুলাইবার ছলে, 'মা' 'মা' বলে ডাকিনা রে।
কাঁদে শচীমাতা নিমাই গেলি কোথা, মায়ের চক্ষে পাষাণ চাপাইলি রে।
বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ে, আজ বুঝাবো কি দিয়ে তার গলে ছুরি মারিলি রে ॥
দেখি স্বপনেতে নিমাই কাটোয়াতে, স্কন্ধে তুলে নিচ্ছে ঝুলি রে।
নিমাই ভাবে উদাসীন, কটিতে কোপীন, ক্ষেপা মায়ের পদধুলিরে ॥

কলি পাচালি

যে কেষ্ট কলিতে, পারিনা আর বলিতে, কাঙ্গালের দিন চলিতে আমার জীবন।
পাঁচসের চালের সমান দর চলে দু আনা মজুরী হ'লে বাঁচে কি জীবন ॥
যত সব মজুর মুটে, খেটে খেতে পায় না পেটে,
থেকে থেকে করে উঠে—হা-হুতাশন।
তেল আর লঙ্কা চল্লিশ টঙ্কা, গোলাব গোল-মরিচের দরে বিকাইছে এখন।
চিনির দরে বিকায় চিটা, লেগে গেল বিষম লেঠা।
বাবুরা তুলেছে মুঠা ভিখারীর মরণ ॥
কাঙালের ছেলে থেতে দে মা ব'লে, সকালে বিকালে করিছে রোদন।
কেবলমাত্র দিনেরাতে একবার খায় জলে ভাতে।
ভাবিতে ভাবিতে তাদের মলিন বদন ॥
ধর্মাধর্ম নাহি জ্ঞান কর্ম, বৈষ্ণবের উপর বিনা দোষে,
ক্রোধ করে—মানবদেহের ঘরে লাগাইলে আগুন।
আপনার আপনি—ডুর আর কপনি—তাহে হবে টানাটানি ওহে নারায়ণ ॥

ক্ষেপা কাঁদে চিরকাল দয়া কর গুরুলাল।
হৃদয়মন্দিরে আসি দাও দরশন ॥

নিম্নে আরও কয়েকটি গানের অংশ তুলে দেওয়া হল—

যে বাঁকা নদীর তুফান থামিয়েছে,
নদীতে নামতে কি তার ভয় আছে ?
যার শুদ্ধ মতি উর্দ্ধ গতি রতিনিষ্ঠা হয়েছে,
তার পাহাড় ভেঙ্গে নামবে নাকো জল।
সে জলে নাইকো নীচে, উর্দ্ধে আছে নদীর মুখে নল ॥
তার নল ব'য়ে জল পড়বে নাকো দ্বারে কপাট পড়েছে।
একটা নয় দিকে ধারা
পিছল ঘাটে নামলে উঠে ঠিক আছে খাড়া।
তাইতে ব্রহ্মলোক উর্দ্ধেতে,
ফল নারিকেলের জল পাত্র বিশেষ আছে ॥

ফকিরের গান

বাউলের মতই পথেঘাটে, গাছের ছায়ায়, পীরের আস্তানায় ফকিরের দর্শন মিলবে। তাঁদেরও সেই দেহতত্ত্বের গান। পরণে রঙবেরঙের আলখাল্লা ; গলায় তসবীর, হাতে ডুবকি, একতারা। বিচিত্র সুর করে গ্রামে গেরস্তের আঙিনায় ফকিরের জং নামে—

প্রভু তোমারি নামেতে তরী হালেতে মনেতে আমারি বাসনা।
আজ ঘেরো ঘেরো ঘেরো ঠাকুর ঘেরো বৃন্দাবন।
বৃন্দাবন ঘেরিলে পাবি কিষ্ট দরশন ॥
সত্যপীর আর সত্যনারায়ণ সত্য যাহার নাম।
বিপদ কালেতে ডাকে স্বয়ং ভগবান ॥
সত্যপীরের নাম লয়ে যে যেবা রাহে[৬৪] যায়।
সাপে না দংশিবে তারে বাঘে না রে খায় ॥
কাষ্টগড়ায় কালাবক্কন কালার মোকাম।
আর হিন্দুমুসলমান কালাকে জানাইছে সালাম ॥
সাগরদীঘিতে আছে মামাভাগ্নে পীর।
তাহার সিন্নি মানাত করে দরিয়ার কুম্ভীর ॥

৬৪। রাস্তা

হাতে হজরতের দেস্তা, কোমরে জিঞ্জির,
বীরচন্দ্রপুরেতে আছে ঠাকুর বাঁকা রায়,
কেমন শোভা করা আছে তার ভস্ম মাথা গায়।
কালো কালো বলো না গো ও গোয়ালের ঝি,
আজ বিধাতা করেছে আমার চারা[৬৫] কি ?

হিন্দু-মুসলমান

এই দুই সম্প্রদায়ের ভাবভাষা ধর্ম সংস্কৃতির সহাবস্থানের উৎকৃষ্ট নিদর্শন মহম্মদের নাম গান গায় ফকির—

মহম্মদ নাম যতই জপি ততই মধু লাগে।
এ নামেরই এত মধু কে জানিত আগে ॥
ঐ নামে জপে মজনু সম ঐ নাম প্রাণের প্রিয়তম।
ঐ নামেরই বুলবুল সদাই হৃদয় জাগে ॥
ঐ নাম চাহি রাহি মুসাফির।
ঐ নাম চাহি শাহানশা শাহী।
আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা নাহি নামের অনুরাগে ॥

জীবন সম্পর্কিত

১। জীবন চলে পবন হাওয়াতে,
ওগো দেহের মধ্যে আছে তিন শো ষাট এক রশা,[৬৬]
সেই রশাল তোমার কালের[৬৭] আছে কষা,
ভিতরে তার কত লাট সাহেবের[৬৮] বাসা।
নষ্ট করলে কেবল ছয়জন মন্ত্রীতে[৬৯] ॥
জীবন............হাওয়াতে।

৬৫। উপায়
৬৬। শিরা উপশিরা
৬৭। পিঞ্জর
৬৮। মনোবৃত্তি
৬৯। ষড়রিপু।

সেই রসা যেদিন পড়ে যাবে ঢিল,
কল অচল হ'বে ঘটিবে মুস্কিল,
শুকাইয়া যাবে রূপসাগরের বিল।
খিল লাগবে তোমার সদর দেউড়ীতে,
জীবন............হাওয়াতে।

২। দেহতরী মূলকাণ্ডারী বসে আছে হাল ধরে,
ও ভাই কোন মিস্তিরী গড়লে তরী,
তরীর নয় দরজা খোলা।
বেলা গেলে সন্ধ্যা হ'লে আপনি লাগে তালা॥
(ও সে) মুখে কালা একেবারে,
সরিয়তের তক্তা তাতে তরিকতের বাঁটে,
হকিকত গোঁজাল এনে মেলে নৌকার দুধারে।
ও সে মারফৎ মাস্তুল উপরে॥
দেহতরী............হাল ধরে।
ওগো একটি নদীর চারটি দাঁড়া, চার পানেতে ধায়,
হেঁকে হেঁকে বেঁকে এক জায়গায় মিশায়।
ও সে আমার তরী পাথারে,
দেহতরী..... ......হাল ধরে।
তন্তরীতে মূলকাণ্ডারী নৌকা বোঝাই করা,
ওগো দুজনা গো মস্ত আছে লিখছে অবিরত।
তাহা হিসাব দেবে একবারে,
দেহতরী............হাল ধরে।
মানব ঘরেতে আজব কারখানা।
ঘরে আড়ে দিকে খুঁজে দেখ চোদ্দ জেলার মহকুমা॥
(ওহো) সেই ঘরেতে রোজ কেয়ামৎ[10] হচ্ছে পূর্ণ শব্দ হায়।
উত্তর অংশে নদীর ধারা দক্ষিণ অংশে গিরি বয়॥
পূর্বেতে হয় ভানুর উদয়, পশ্চিমেতে এক মহাশয়।

১০। ধ্বংস

ঘরের আটকুটুরী[১১] পড়ে রবে খাসমহলের[১২] খাসনামা।
মানব ঘরেতে আজব কারখানা ॥
ওগো সেই শহরের আদি খবর যদি মনে শুনিতাম,
ঘরের ভিতর কি কি ছিল সকল দেখিতে পাইতাম।
আমলা যদি পালাইবে, মামলা তোমার কে করিবে ?
নিজে হাকিম উঠে যাবে শ্মশান হবে সাতখানা ॥
কতশত ফকির বোষ্টম পায় না ঘরের অন্বেষণ।
ঘুরে ফিরে মাকড়া জালে বন্দী হইলাম এখন ॥
আলেফের ঘর হয় না খাঁটি থেকে থেকে চমকে উঠি।
আবার মুদলে পরে নয়ন দুটি মাটি হবে বিছানা।
মানব ঘরেতে আজব কারখানা ॥

নবীর রূপস্তুতি

দেখে যা রে দুলাল সাজে সেজেছেন মোদের নবী।
বলিতে সে রূপমধু হার মানে নিখিল কবি ॥
আজ আর সে বাসরঘরে হবে মোবারক—বাদ আলম,
আসমানে যাই মশাল জেলে গ্রহ তারা চাঁদ রবি।
হুরপরীগণ গায় নাচে আর দেয় মোবারক—রুই ইয়াৎ,
খোদার জ্যোতি ঝুঁকে পড়ে দেখে সে মোহনছবি।

কবিগান

কবিগানের উদ্ভব সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন: "অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই ছড়া কাটিয়া ঢোলকাঁসির সঙ্গতে গান করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এইরূপ ছড়াকে বলিত আর্য্যা অথবা তর্জা অথবা আর্য্যাতর্জা। বৌদ্ধ ও শৈব সাধকেরা প্রাচীনকাল হইতেই অধ্যাত্মবিষয়ক ছড়া বা প্রহেলিকা রচনা করিতেন তাহার নিদর্শন পাই চর্য্যাগীতিতে। পরবর্তীকালে শৈবসিদ্ধাদের গীতির মধ্যেও এইরূপ ছড়া ও গান পাই। শ্রীচৈতন্যের সময়েও শৈবসিদ্ধাদিগের ছড়া প্রহেলিকা প্রচলিত ছিল।

১১। ফুসফুস
১২। হৃদয়

…পরে এইরূপ বাঁধা ছড়ার সাহায্যে আসরে উত্তর প্রত্যুত্তর ও বাকোবাক্য পদ্ধতি চলিত হয়। ইহাই দাঁড়া কবি। 'দাঁড়া' শব্দের অর্থ হইতেছে বাঁধা গীত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী তীরভূমিতে দাঁড়া কবির গাওনা জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের অন্যতম প্রধান উপায় ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অশিক্ষিত তরজাওয়ালাদের হাত হইতে দাঁড়া কবি শিক্ষিত গীত রচয়িতাদের হাতে পড়িয়া কতকটা ভদ্রসমাজের উপযুক্ত হইল। আসরে বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে গান রচনার ধারাও প্রবর্ত্তিত হইল। ইহাই 'কবিগান'। এইরূপ গীত যাহার গান করিতেন তাঁহারা কবিওয়ালা নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। অনেক কবিওয়ালা স্বয়ং গান রচনা করিতেন। যাহারা গাহিতেন না শুধু গান রচনা করিতেন তাঁহাদের বলিত 'বাঁধনদার'।……

কবিগাহনার প্রথম গান হইত "মালস" বা ভবানীবিষয়ক, তাহার পর সখী-সংবাদ ("ব্রজলীলা বিষয়ক), তাহার পর খেউড়, শেষে প্রভাতী।"

পশ্চিমবাঙলার সুবিখ্যাত কবিয়াল ৺লম্বোদর চক্রবর্তী এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে কবিগানের উৎপত্তি সম্পর্কে যে অভিমত জানিয়েছেন তা নীচে দেওয়া হল—

অনেকের মতে রাজপুতনার চারণকবিরাই কবিগানের ঐতিহাসিক উৎস। কিন্তু চারণকবিরা একদেশদর্শী, আর কবিয়াল বহুদেশদর্শী। তর্ক করে নিজের অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করা বাঙালী জীবনের আদিম প্রবৃত্তি। পরস্পর পরস্পরকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করতে গিয়ে কখনও বা বিকৃতরসের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। মানুষের শুভবুদ্ধি ও সুরুচি হতে কবি-গানের জন্ম হয় নি। সমাজের পঙ্কিলগর্ভেই এর জন্ম। বিকৃতমনের খোরাক জোগাতে গিয়েই কবিগানে আদিরসের প্রাদুর্ভাব।

বর্তমানে কবিগানের আসর ও পরিধি ব্যাপক। শ্রোতৃমনের রুচির চাপে এবং ইতিহাসের প্রয়োজনে কবিগান এখন অনেকাংশে সাহিত্যধর্মী। যে কোন কবিসঙ্গীতে কবিয়ালই হল মূল গায়েন। গায়ে চাদর জড়িয়ে, কখনও চাদর কোমরে বেঁধে আসরে নামেন কবিয়াল। অত্যন্ত বিনীত ও শ্রদ্ধা সহকারে সুরু করেন বন্দনাগীতি, তারপরই আসরের শ্রোতাদের দেওয়া নিজের ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করেন। বর্ণনার সাথে বিচিত্র তালে ঢোল বাজতে থাকে। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে আসরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। এবং প্রতিপক্ষকে উপহাস ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে হেয় প্রতিপন্ন করেন। প্রতিপক্ষ প্রথমপক্ষের সমস্ত

যুক্তি খণ্ডন করে নিজের ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করেন এবং কতকগুলি চমকপ্রদ প্রশ্নের অবতারণা করেন। তর্কযুদ্ধ জমে উঠে। কখনও কখনও পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্নজাল বিস্তার ও উত্তরদান করেন। একে 'বোলকাটাকাটি' বলে। বাংলার বহু গবেষক পণ্ডিত এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

কবিগানের পালার বিষয়বস্তু ধর্ম ও অধর্ম (সামাজিক), অদৃষ্ট ও পুরুষাকার (আধ্যাত্মিক), শিক্ষিত ও কৃষক (সামাজিক ও অর্থনৈতিক), শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্যোধন, রাম ও রাবণ (ঐতিহাসিক), অতীত ও বর্তমান, কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি (আধুনিক) বিষয়। এই ধরনের দ্বন্দ্বযুদ্ধে অতীতের ভূমিকায় অবতীর্ণ কবিয়াল আধুনিক বাবুদের ব্যঙ্গ করে বলেন—

কলিকালে বাবু অবতার, আমি জানাবো মহিমা তাহার।
সেই বাবুদের গুণগরিমা, আমি করিব বিস্তার ॥
বাবুদের অপার মহিমা, বেদে নাই সীমা।
উদার চরিত্র বহুভাষী চক্ষেতে চশমা ॥
তারা বলেন না যে বাবা মা, বলেন তারা ড্যাডি, ম্যামি,
তাদের মহিমা বোঝা ভার।
যাঁরা বাক্যে অজেয় পরভাষাপ্রিয়, মাতৃভাষা তাদের কাছে অতিশয় হেয়,
তাঁদেরই বাবু জানিও সবিশেষ কহি তা এবার।
যাঁদের চরণদ্বয় মাংসবিহীন হয়, শুষ্ক কাষ্ঠ ন্যায় হ'লেও পলায়নে নাই ভয়,
যদিও হস্ত দুর্বল হয় অতিশয়, তবু তাদের লেখনী হয় ক্ষুরধার,
আসরেতে মহিমা সে করি গো প্রচার।
যাঁদের হয় কোমল তনু, আমি নিশ্চয় কহিনু,
সাগর পার নির্মিত দ্রব্যের প্রহার সহিষ্ণু।
যাঁদের এইরূপ প্রশংসা শুনিনু তাঁরাই বাবু পরিস্কার ॥
অপব্যয়ের কারণে করবেন উপার্জন,
আর উপার্জনের জন্য করবেন বিদ্যা অধ্যয়ন।
করেন বিদ্যার কারণ প্রশ্নহরণ, তাঁরাই বাবু চমৎকার ॥
এঁরা দ্বিতীয় অগস্ত্য কথা যে সত্য,
অগ্নি এদের আজ্ঞাবহ—মিথ্যা নহে তো।
বাবুরা খাণ্ডব দহন করতে ব্যস্ত, তাই তামাক চুরুট ব্যবহার ॥

এইভাবেই গান গেয়ে চলেন কবিয়াল। কবিগানের পরে আমরা কীর্তন সম্পর্কেও সংক্ষেপে কিছু বলবো।

উত্তর-রাঢ়ের সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় জীবনে কীর্তনের বিরাট ভূমিকা। এই অঞ্চলে কীর্তন গানের বহুল প্রচলনের কারণ বৈষ্ণবধর্মের অপার মহিমা নবদ্বীপ, শান্তিপুর হতে সুরু করে কাটোয়ার মধ্য দিয়ে বীরভূমের প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসার। চৈতন্যোত্তর যুগে কীর্তনগানে রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রবেশ করেছে। ভক্তিরসের প্রাবল্যে, দীর্ঘকালের সংস্কার ও সাধনায় এই সঙ্গীতের একটি বিশেষ ধারার জন্ম হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ একটি গানের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে—

তাহারে তা না না তারনা, না না হো
তাহারে তা না না তারনা, না নানা হো
তকাই মে দই ইকে শিদা লং লুধে
লপন ভুরি সিলি লিকান কারাম দ
লাঠি ধর হে, গুরু বল হে, গুয়ালমি যাবে বিটা উয়া
কনে বনে গুরু হে ভালা চরায়, গুলায়নি যাবে বিটাউয়া।

এই অঞ্চলে মনোহরশাহী শাখার কীর্তন গানের বিশেষ প্রচলন। মনোহরশাহী শাখার উৎপত্তিস্থল কাঁদরা গ্রাম উত্তর-রাঢ়েরই অন্তর্ভুক্ত।

চৌপহল্লা

ঘাটোয়াল সম্প্রদায় সাধারণত রাসপূর্ণিমায় এই গান গায়। মৃতকাজ (শান্তি-স্বস্ত্যয়ন) বা শুভকাজে (বিবাহ, অন্নপ্রাশন) এই গান গাওয়া হয়। বাদ্যযন্ত্র থাকে মৃদঙ্গ আর ঝাল। যিনি মূল গায়েন তার পায়ে নূপুর বাধা হয়। ভজনের সুরে এই গান—এখানেও সেই রাধাকৃষ্ণের লীলা—

আজো গোকুলাসেঁ আয়ে গোপালজী
রাধা লোলিতামে চামর দোলায়ে
কাঞ্চন থালা কো পুরা কে বাতি।
(ধুঃ) সুরপুর মনি শঙে লাগায়ে আরতি,
সুর হো দাস প্রভু তুমারে দায়া থাকো
(ধুঃ) আংক কমলা এল সির পর চড়ায়ে।

মনসামঙ্গল

বঙ্গ সংস্কৃতির আসরে মনসামঙ্গল একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে বসে আছে। কীর্তন, চৌপহল্লার মত এসঙ্গীতও যৌথ সঙ্গীত যদিও এখানে একজন মূল গায়েন থাকেন। বিভিন্ন পুরাণাদি পাঠ করে এদেশের মানুষ মূলভাবটিকে বজায় রেখে নিজের ভাষায়—কখনও গানে, কখনও কথায়, মনসামাহাত্ম্য বর্ণনা করেন।

আসরে ধূপদীপ জ্বালিয়ে ও নৈবেদ্য সম্মুখে রেখে বর্ণনাগীতি সুরু হয়। প্রথমে খোল, করতাল, মন্দিরা, নুপুর ও জং সহযোগে একটি ঐক্যতান সৃষ্টি করে। তারপর সুরু হয় গান—

ধুয়া— বন্দি মা মনসা দেবী শঙ্করনন্দিনী,
নাগমাতা তুমি মা-গো জগৎজননী,
একবার দয়া করে এস মাগো।

কাটান— ত্রিবেণী ছাড়িয়া একবার দয়া করে এস মাগো।

(এই বলে মাতান সুরু হয়)

পয়ার— এস এস মাগো মহাভাগা আস্তিকের মাতা।
জরৎকারু মুনিপত্নী ত্রৈলোক্যপূজিতা॥
এস এস বরদাদেবী কল্যাণকারিণী।
অযোনীসম্ভবা শ্রেষ্ঠ নাগ আভরণী॥
সুচারু অঙ্গের প্রভা অরুণ বসনা।
পদ্মালয়ে পদ্মা তুমি বাসুকী ভগিনী॥
সংসার সাগর হতে রক্ষ মা জননী।
অনন্তাদি অষ্টনাগ সাপের প্রধান।
সবে লয়ে পূজা যজ্ঞে হও অধিষ্ঠান॥
এস মাগো স্বতিশাখে কর আরোহন।
পুত্র, আয়ু, ধন হেতু পূজিব চরণ॥
পঞ্চগব্যে শীতল তোয়ে স্নান করাইব।
যথাসাধ্য উপাচারে তোমারে অর্চিব॥
পুত্র, আয়ু, ধন কর সম্পত্তি প্রদান।
সর্পভয় হতে মাগো কর পরিত্রাণ॥
নমি মাগো ভগবতী নমি বিষহরি।
সিদ্ধরূপা তুমি মাগো প্রণমি কুমারী।

অবোধ চাঁদসদাগর বিবাদ করিল।
অবশেষে তোমার মাগো শরণ লইল ॥
ভোগৈশ্চর্যাময়ী তব অপার মহিমা।
সুরেন্দ্রাদিদেব নর সদা পূজে তোমা ॥
তোমার মহিমা কথা অমৃতসমান।
হরি হরি বলুন সবে ভক্তগণ ॥

বন্দনাগীতির পর 'পূজা' পালার ভূমিকা। কথায় তা ব্যক্ত করে গায়ক—

একদিন লোমশমুনি তপোবনে মহাধ্যানে বসে আছেন, সেই সময়ে সনকমুনি তাঁর কাছে গিয়ে পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে পূজার পর করজোড়ে অনুরোধ করলেন : 'হে প্রভু দয়া করে আমাকে মাতৃগুণ কীর্তন গেয়ে শোনান। লোমশমুনি জিজ্ঞেস করলেন, মাতৃগুণের তুমি কি শুনতে চাও? জবাবে সনকমুনি বললেন, কিভাবে বেহুলা নিজ পতি লখিন্দরকে জীবিত করে আঠারো বাঁকে পূজা দিতে দিতে রামেশ্বরের ঘাটে এসেছিলেন, এবং কিভাবে চাঁদসদাগরের কাছে মায়ের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন, তাই বলুন'।

তারপর কখনও গানে, কখনও কথায় দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা চলে।

উত্তররাঢ়ের লোকসঙ্গীতের পর্য্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে এর আঞ্চলিকতা সারা বাঙলার লোকসঙ্গীতের অখণ্ডতাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। চলমান জীবনের বিচিত্র ও বিবিধ সাংস্কৃতিক ধারা উপধারার দুরন্ত প্রবাহে এই আঞ্চলিক সংস্কৃতি গতিশীল। উত্তর-রাঢ়ের বৃহত্তর অংশে রুক্ষ মাটি। গঙ্গা আর অজয় এর প্রান্তভাগ স্পর্শ করেছে। আর এক প্রান্তে রয়েছে সাঁওতাল পরগণার চড়াই উৎরাই পথ। এই রুক্ষতা আর ধূলিধূসরতার মাঝেই মাটির গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ আর মোহ নিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা। শিল্প-সাহিত্য, নৃত্যগীত, আচার-ব্যবহার, সংস্কার-বিশ্বাস, স্থাপত্য-ভাস্কর্য্য, ললিতকলা, মেলা আর উৎসব। উত্তর-রাঢ়ের এই সাংস্কৃতিক চেতনা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হতে যেমন গ্রহণ করেছে অনেক কিছুই ঠিক তেমনি উদারভাবে দানও করেছে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যত বৃহত্তর ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে পরিব্যাপ্ত, সাংস্কৃতিক চেতনাও সেখানে তত উদার ও উন্মুক্ত। যখন এই আঞ্চলিকতা গোষ্ঠীমনস্তত্ত্ব আর সংস্কারের বিবর্তনে প্রাকৃতিক পরিবেশের সহযোগিতায় সুসংবদ্ধ হয় তখন তা বৃহত্তর মৌলিক চেতনার অংশীদারত্বের দাবী করে।

উত্তর-রাঢ়ের লোকসঙ্গীতের আলোচনায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সহজেই

চোখে পড়ে। প্রথমত—গানের সহজ, সাবলীল ভাব ও ভাষা। এই আড়ম্বরহীন ভাষা গণচেতনা উন্মেষে সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত—বাউল, বৈষ্ণব আর সহজিয়াদের জীবন দর্শনের প্রভাব যা লোকসঙ্গীতে তত্ত্বের সংমিশ্রণ। তৃতীয়ত—প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চতুর্থত—এদেশের লোকজীবনের যাবতীয় ধর্মীয় আচার লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়েছে।

মেলা

লোকসঙ্গীত বিকাশ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে মেলা উৎসবের অবদান অপরিসীম। মেলাকে ঘিরেই গণজীবনের অভিসার। লোক জীবনের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে বৈচিত্র্য তা এই মেলাখেলাকে কেন্দ্র করেই। তাই লোককবি বলেছেন—

কেউ যদি মানুষ হ'তে খোঁজ,
তবে মানুষে মানুষকে ভজ।
দাস নিত্য বলে—মানুষ যায় ভ্রমণে মানুষে দেখিতে,
আছে—আছে রে মানুষ—এই মানুষেতে॥

'যদি মানুষ হ'তে চাও, যদি মানুষ দেখতে চাও, তবে মানুষের ভীড়ে মিলেমিশে যাও। চলে এসো গ্রামদেশের পূজাপার্বণে, মেলাখেলায়।' সেই মেলায়—যেখানে নানা মানুষ মেলে, হাজারো মানুষের মন মিলে যেখানে ঐক্যতান রচনা করে। শুধু মনটি যেন রসিক হয়। এদেশে অভাব নেই মনের মানুষের। অভাব মেলামেশার সুযোগের। রসের ভিয়ানে রসনা সিক্ত হয়। ধানের শীষ পাকে, সোনারঙ ধান আনে সম্ভাবনার সুখ। সুরু হয় নানা মেলা, শান্তিনিকেতনের মেলা, জয়দেবের মেলা। আরও কত কত। কোথাও সামাজিক উৎসবে, কোথাও বা গ্রামীণ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূত্রে মেলার পর মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে চলে এই অঞ্চলে একে একে।

আমোদপুর কাটোয়া রেল লাইনের রামজীবনপুর ষ্টেশন। ষ্টেশন হ'তে ছ' সাত মাইল দূরে কধিয়া গ্রাম। এই গ্রামে মাঘী সপ্তমীর দিনে একটি মেলা হয়। চলে তিন দিন। শোনা যায় সিদ্ধপুরুষ গোপালদাস বাবাজী এই মেলার প্রবর্তক। আউল বাউলের মত তাঁর কোন জাতবিচার ছিল না। কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, সকলেই জাতিধর্মনির্বিশেষে তাঁর ভক্ত।

বিরাট এক দিঘীর চারপাশ জুড়ে এই মেলা। বাঁশ, টিন আর চট দিয়ে তৈরী হয় অস্থায়ী দোকানঘর। কুলবধূ সারা বছর ধরে একটু একটু করে সঞ্চয় করেছে যে সামান্য ধন তাই নিয়েই সে মেলায় আসে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব মিটিয়ে নেয়। মেলা তো নয় যেন গোলকধাঁধা। প্রথমে দীর্ঘ এলেকা জুড়ে শুধু এলুমিনিয়মের বাসন, কাঁচের চুড়ি, শাঁখা আর ফটো বাঁধাই-এর দোকান। চলচ্চিত্রের নামকরা অভিনেত্রীর পাশেই মহিষমর্দিনীর সহাবস্থান। একপাশে শুধু মেয়েদের ভীড়। চুড়ির দোকানে এসে বাচ্চা মেয়ের বায়না সুরু হয়। এক-সাথে সব চুড়ি হাতে পরার সখ। বাঁশবনে ডোম কানা। দোকানদার জানে শিশুর মনস্তত্ত্ব। ঠিক পরিয়ে দেয় মনোমতন চুড়ি। এরপরেই চীৎকার শোনা যায় 'লে লে বাবু সাড়ে ছ' আনা'। কানের পাশে হাতের তালু রেখে ওস্তাদী গান গাওয়ার ঢঙে সমানে চীৎকার করে চলেছে দোকানী—হরেক মাল সাড়ে ছআনা। অনেক মনোহারী দোকান বসেছে রকমারী পসরা সাজিয়ে। কিন্তু সাড়ে ছ আনা আর দশ পয়সার প্লাষ্টিকের দোকানেই ভীড় বেশী। এরই মাঝে এক দর্জ্জি তার সেলায়ের মেসিন নিয়ে বসে আছে। বসেছে খুচরো দোকানদার পথের ধারে মাটিতে চট বিছিয়ে সামান্য সংগ্রহ তার। আর একটি বড় বই-এর দোকানে বিভিন্ন প্রকাশকদের যৌনগ্রন্থ হতে সুরু করে শাস্ত্রগ্রন্থ সবই ছড়িয়ে আছে। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল আর চামড়ার কাজের দোকানও এসেছে। ঘর সাজানো সৌখীন জিনিষের দোকান তার পাশেই। মাঝে দু'সারি রেডিমেড পোষাক আর ধুতিশাড়ীর দোকান। তারপরেই খাবারের দোকান আর রেস্তোঁরা।

এবার কিছু রঙবদল। দোকানের এলেকা শেষ হয়, সুরু হয় চিড়িয়াখানা, যাদুখেলা, সার্কাস ইত্যাদির তাঁবু। শ্রোতা আর দর্শকদের আকৃষ্ট করার জন্য অবিশ্রান্ত মাইক বেজে চলেছে। কোথাও বা 'সঙ' চীৎকার করছে।

দক্ষিণদিক ঘুরে পূর্বদিকেও দেখা যাবে সারি সারি খাবারের দোকান, কাঠের বাসন আর ছোট ছোট আসবাবপত্রের দোকান। কেনাবেচা চলে গ্রামের বৌ, ঝিদের সাথে চলে অবাধ দর কষাকষি।

আছে বৈষ্ণবীর ভীড় বেশী। এক মাঝবয়সী বৈষ্ণবী এক কমবয়সী বৈষ্ণবীর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে হেসে। গলার মালা কিনছে যে তাই এত রস। চলতে চলতে গাছের গুঁড়িতে নোটিশ দেখা যাবে 'হরকালী ঔষধালয়ে' গাঁজা পাবেন। এ রসের নাগরও আছে মেলায়। পথেবিপথে ছড়িয়ে আছে হুঁকোকলকে আর

খড়মের দোকানের বৈচিত্র্য। আছে লোহার ও টিনের আসবাবপত্রের দোকান। মানুষের ভীড়। শোনা যাবে—'এই যে বাবু, পালিশ', 'এই যে স্যার ফটো তুলে দিই' 'বোম্বাই কা রাণী ছিল, বারো হাত তার চুল ছিল' ইত্যাদি।

স্থানীয় বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ। ওপাশে দীঘির ধারে বিরাট এক অশ্বত্থগাছের তলায় জনৈক বৈষ্ণব গান জুড়েছে। বয়সের ভারে জীর্ণ। বেশবাসের জীর্ণতার সাথে বার্দ্ধক্যের অসহায়ত্ব কিন্তু তার কণ্ঠস্বরকে ম্রিয়মাণ করে নি। কিছু ব্যক্তি চার পাশে পা ছড়িয়ে বসে এই গান শুনছে—

গৌউর নাম আর ভুলবো না আমি হবো গৌউর কলঙ্কী,
যে যা বলবে সে তাই বলুক পরের কথায় হবে কি ?
যেদিন হতে রূপই হেরেছি আমাতে কি আমি আছি
ধনকুলমান সব দিয়েছি ঐ গৌউর পদে প্রাণ দিতে আর বাকি কি ?

শুক্লপক্ষের রাত। বসন্তের আমেজ। মেলাতে রাত কাটিয়ে ভোরে পথ চলার সুরু। পথে বাউলের গান ভেসে আসে। একতারা, ডুবকি আর খঞ্জনীর ঐক্যতানসহ বাউল গেয়ে চলেছে

ডাকার মত ডাকলে পরে
কানে কানে কথা বলে।

তুমি যাকে ডাকো তোমার কাছেও যে তার ডাক আসে। সে ডাকার টানেই তো মেলা। কতশত মানুষের সাথে দেখা হয় এ মেলায় ওদের দেখে যেন মনে হয় ওরা কতকালের চেনা। বিচিত্র রসের কারবারী মন মানুষের রস খোঁজে। বৈরাগীভাবের ছোঁয়া লাগে প্রাণে। মানুষের ভজনা করে মানুষ প্রেমের লীলা চলে মানুষকে ঘিরে।

পরিশিষ্ট

সংগৃহীত বহু গানের কিছু উদাহরণ, ইতিপূর্বে এসব গানের আলোচনা করা হয়েছে। উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে।

ভাজুই-এর গান

১। একদিনকার ভাজুই আমার দুই-এ দেবেন পা,
তবু তো সোনার ভাজুই তোলে না গো গা।
তোল রে ভাজুই গা তোল,
বসতে দেব শীতলপাটি খেতে দেব ননী।
ক্ষীর ক্ষীরেটা ক্ষীরের নাড়ু আমার যাদুমণি॥

দুইদিনকার ভাজুই আমার তিনে দেবেন পা,
তবু তো সোনার ভাজুই তোলে না গো গা।
... ...
... ... যাদুমণি॥
... ...
... ...

আটদিনকার ভাজুই আমার নয়-এ দেবেন পা,
তবু তো ... ... গা,
... ...
যাদুমণি॥

২। গোবরে মাটিতে মা হয়েছ কালো।
ধূপে সিন্দুরে মা হয়েছ আলো॥
ধূপের ধূমো নাইকো ঘরে,
ভাজুই ক্ষেপেছে সবার উপরে।
ভাজুই প্রকাশ ধরেছে॥

৩। তোরা পৈতা জোগালি, কাটারি কাটায়ে তুললাম মাটি
তাতে উঠলো বামুনবিটি।
উঠ কেন লো বামুনবিটি, দেখ্ কেন লো বিয়ে,
আমার ভাজুই-এর বিয়ে শনি মঙ্গলবারে।
ভাজুই মা শনি মঙ্গলবারে॥
তোরা পৈতা জোগালি কাটারি কাটায়ে তুললাম মাটি,
তাতে উঠলো কুমোরবিটি।
উঠ কেন লো কুমোরবিটি দেখ্ কেন লো বিয়ে,
আমার ভাজুই-এর বিয়ে শনি মঙ্গলবার
ভাজুই মা শনি মঙ্গলবার॥

৪। আমার ভাজুই বেড়াতে যাবে বামুনপাড়া দিয়া,
আমার ভাজুই বেড়াতে যাবে কুমোরপাড়া দিয়া,
আমার ভাজুই বেড়াতে যাবে গোয়ালপাড়া দিয়া,
আমার ভাজুই বেড়াতে যাবে বাগ্দিপাড়া দিয়া।

৫। কিবা নদী অলু থলু কারে দিয়ে পাঠাব দুটি চাঁপার ফুল।
কিবা নদী এঁকা বেঁকা কারে দিয়ে পাঠাব দু জোড় শাঁখা॥
আমরা যাব আলে আলে ভাজুই যাবে নায়ে[৭৩],
হাতের কঙ্কন বাঁধা[৭৪] দিয়া ভাজুই চড়াবো নায়ে।

৬। আমার ভাজুই-এর কি খেতে মন,
হাতের ট্যাঙারী মাছ আর বাড়ীর বেগুন।
বাড়ীর গাছে শুয়োর বন শুয়োর ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ,
ডাকুক শুয়োর পোহাক রাত আমার ভাজুই-এর নিশিরাত।

৭। ভাজুই লো কল্কলানী মাটি লো সরা কাল ভাজুই-এর বিয়ে,
বেলফুলের মালা ভাজুই মা পদ্মফুলের মালা॥
ও পাড়াদের ভাজুইগুলো জলের গুগুলী।
আমাদের ভাজুই সোনার মাদুলী॥
ও পাড়াদের ভাজুইগুলো সাপে খেয়েছে।
আমাদের ভাজুইগুলো ঝাড়তে গিয়েছে।

৭৩। নৌকা
৭৪। বন্ধক

ও পাড়াদের ভাজুইগুলো পাটকাঠির বোঝা।
আমাদের ভাজুইগুলো ওঝা, ওঝা, ওঝা ॥
ও পাড়াদের ভাজুইগুলো যায় অলিগলি।
আমাদের ভাজুইগুলো খায় শশার জালি।
সাজতে গুজতে ঘামলো গা কে কোথা আছিস।
সর জিনি গা মুছিয়ে যা ॥

ভাসান

ভাজুই ভাসায়ে আমরা করবো কি ?
শিল যাঁতা বুকে দিয়ে মরবো জি।
ভাজুই মা যেওনা আলে বিলে শঙ্খচিলে মারবে ছোঁ,
সেরল পুঁটি বলে ভাজুই মা সেরল পুঁটি বলে।
ভাজুই ভাসায়ে আমরা খাবো কি ?
ঠারে আছে চালভাজা ভাঁরে আছে ঘি।
ভাজুই মা—তাই খাবো জি ॥
ভাজুই মা—ও পথে যেও,
বেনার ঝাড়ে কড়ি আছে, মণ্ডা কিনে খেও।
ভাজুই মা—মণ্ডা কিনে খেও ॥
আমার ভাজুই-এর মাথায় উকুন হয়েছে,
ননদ নাই, শাওড়ী নাই তুলে দেখে কে ?
ভাজুই মা তুলে দেবে কে ?

হাপুর গান

১। আরে মাগো মাসী তেলকলসী তেলটা বড় চিটে।
শুন দোকানী শুন, তোর বৌয়ের কত গুণ,
আঁধার রাতে পান খেয়ে গালে লাগিয়েছে চুণ।
চুণ লয়, খয়ের লয়, শিমূলেরই আঁটা।
একটা চাপড় দিয়ে দেব চাঁদের গায়ে ব্যথা ॥
পটাস ধুম চারকালে তোর কিসের ঘুম।
ছেঁড়া কেঁথাতে মারবো ঘুম ॥

২। চল চল ফুল আতাপাতা লো
পুপু সাপ দেখে যা লো, পুপু ট্যামনা চিতি লো।
পুপু কোথায় গেছে লো? পুপু কি আনবে লো?
পুপু কাজল লতা লো, পালকি এসেছে,
পালকির উপর উলকি দিয়ে কনে এসেছে।
চল লো ফুল চল লো ফুল ঘুঁটে কুড়োতে।
না লো ফুল মাথা ধরেছে ॥

সাময়িক ছড়া

চল্লিশ টাকা মণ ধান হলো আর যাট টাকা মণ চাল হ'লো,
তবে কেমন করে গরীব লোক সব প্রাণে বাঁচবে বলো?
চালের দরে বিক্রী হচ্ছে মটর ও মশুরী।
সারা দিনমান খেটে মোদের দেড় টাকা মজুরী ॥
তাতে চাল কিনবো, না তেল কিনবো, তাই মোরে বল না?
স্ত্রীপুরুষে বসে ভাবে—উপায় তো আর দেখি না।
এসব কলির লীলা, আজব খেলা, জানাবো আর কারে,
কতদিন যে হয়নি ভাত উপোস থাকি ঘরে।
বড় বড় গেরস্তগুলো বসে ঘরের কোণে,
স্ত্রীপুরুষে যুক্তি করে বসে দুই জনে।
বলে—কেউ যদি চাল কিনতে আসে মোদের বাড়ী,
যত কমে দিতে পারি, দু'টাকায় একসের করি।
গিন্নি হেসে বলে—ওগো আমার কথাটি শুন না,
আক্রা দরে চাল বেচিয়া দিও গো গহনা।
বড়লোকদের টাকায় বোঝাই হয় যে বাক্সহাঁড়ি
টাকার জোরে কিনছে কত জমি পাকাবাড়ী।
কংগ্রেস রাজত্ব লয়ে করেছে অর্ডার
জায়গায় জায়গায় বীরভূমেতে হয়েছে বর্ডার।
কোনরকমে খেটেখুটে টাকা জোগার করি,
ধান চাল কিনে আনতে গেলে হুমগারে লয় কাড়ি।
কেউ কেউ যুক্তি করে বলে যাব গেরস্তের বাড়ী,

আমায় কিছু দেন মহাশয় চালধান খেঁসারী।
আমি খেটেখুটে শোধ করিয়া দেব মহাশয়,
তখন ঘরে গিয়ে বলে গেরস্ত আমার কিছুই নাই।
নগদ দালাল এলে গেরস্তলোক উঠে তাড়াতাড়ি,
বলে আমি কিছু বিক্রয় করবো চাল ধান খেঁসারী।
এতসব থাকতে মোয়া, পাই না খেতে, রাখে গোপন করে।
তাই গরীব এবার মরল বুঝি হা ভাত হা ভাত করে।।
দুটো একটা ছিল মোদের ঘটি আর বাটি।
পেটের দায়ে ওগো দাদা সব করিলাম মাটি।।

মনসা পূজার গান

১। একদিন উত্তরিল গহন কাননে।
গহন কাননে ভাই দিব্য সরোবর।
কালকূট বিষ ভাসে তাহার উপর॥
সেই বিষ কৃষ্ণচন্দ্র আপনি খাইল।
গৌউর বরণ ছিল কৃষ্ণ বিষে কালি হল।
ললিতে উড়ান মন্ত্র ঝাড়িতে লাগিল,
ঝাড়িতে ঝাড়িতে কৃষ্ণ চেতন হইল।
চেতন পাইয়া কৃষ্ণ জ্ঞান করিলেন স্থির,
পশ্চাতে স্মরণ করিলে গড়ুর মহাবীর।
গড়ুর গড়ুর মহাগড়ুর
পক্ষে তুলি বর আহা পক্ষীশ্বরে
হিঁপছে দেখ কালিদহের জল।
ঝাঁপাসাপ মারেন দেবী করে সাঁই সাঁই,
উঠরে অমুকের মরা আর বিষ নাই।
গৌউর যেছেন বাপের বাড়ী কুকুর অঙ্গে হে রে
অঙ্গের বসনখানি উড়াইল ঝড়ে।
রাঙা ফুল, রাঙা ফল, রাঙা তার ডাঁটা
উঠরে নাগিনীর বিষ শুনে আদিকথা।
নীলবরণ বিষ পানি হয়ে যায়।

নাই বিষ নাইরে কালকূটের বিষ অমুকের গায়।
দয় মা—মনসার দয়।

২। একদিন কৃষ্ণ বসেছিল ধ্যানে,
ফুল তুলিব বলে কৃষ্ণের পড়ে গেল মনে।
হাতে কৃষ্ণের মোহন বাঁশি মাথায় চাঁচর কেশ,
হাসিতে খেলিতে গেলেন কালিদহের কূল ॥
কালিদহের কূলে আছেন নাগনারী,
কৃষ্ণকে গিলিতে এলেন সরাসরি,
কৃষ্ণ বলেন—থাক্ রে আমি কালিয়দমন করি।
কালকূটের বিষ আমি দৃষ্ট মাত্র মারি
নাইরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ গরুড়ের সহায়
নাম নাম কালকূটের বিষ থাকে শ্রীরাধার দোহাই।

মাড়ুলী পূজার গান

সাঁঝ দিলাম, সলতে দিলাম, স্বর্গে দিলাম বাতি।
সব দেবতাকে সন্ধ্যে দিলাম (ভাইরে) দিলাম সরস্বতী।
বেউল বাঁশের বাহকখানি খানিক পাটের সিকে,
কেষ্টর কাঁধে দধি নিয়ে চলিল রাধিকে।
কৃষ্ণ বেচেন দধি (দুগ্ধ ভাইরে) রাধে সাধেন গোকড়ি,
পার করো—পার করো ওহো নাই রে—বেলা ব'য়ে গেল,
কত দধিদুগ্ধ নষ্ট হ'ল—তার হিসাব নাই রে—বেলা বয়ে গেল।

লেটোর গান

দেহতত্ত্ব বিষয়ক—

চল হে তরীক[৭৬] পথে নবী মোস্তফার
ছেড়ে দাও কুফরী[৭৭] চলন হও দিনদার
ব্যাপার করতে ভবে এসে বন্দী হ'লাম মায়া ফাঁসে
কি হ'বে তোর অবশেষে ভাব হে একবার ॥

৭৬। ধর্মের পথ
৭৭। খারাপ পথ

এসে বান্দা দুনিয়া পরে নামাজ রোজা দিলে ছেড়ে
শয়তানীর ফেরবে[৭৮] পড়ে হ'লাম গুনাগার।
তুমি না শুনেছ কাউরি কাছে
জন্মিলে মোত[৭৯] আছে
মোতে খাড়া আছে পিছে, হও হুঁসিয়ার
করহে নেকির পেশা তোদের কুফর হবে না আশা
জিন্দগীর নাই ভরসা, দুনিয়া মাঝার।
থাকিতে হায়াত বাকি
যত পার কর নেকী—হও খবরদার।
তোমায় যেতে হবে কবরেতে ও মোমিন ভাই এই বেলাতে
নেকী তো যাইবে সাথে খরচ ও রাস্তার।
সায়ের মকুমিয়া ভেবে বলে দিন গেল মোর গোলেমালে
কি হবে হিসাবকালে আমি গুণাগার।

সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মাতৃবন্দনা

মায়ের সেবা কর রে ভাই যাইবে তরি।
মার দোয়াতে ভবপারে যাইবে তরি ॥
রসুলের ঐ জামানাতে[৮০] একজুনা আকলিম নামেতে
সে জুন কুন বেমারিতে[৮১] যাইলো মরি।
রসুলুল্লা পয়গম্বরে পুছিলেন আকলিমের গোরে[৮২]
দেখেন নবী সেই কব্বরে আজাব[৮৩] হয় ভারি।
আকলিমের মাতাকে আনি পুছিলেন হজরত তখুনি
কি গুণা করেছে বলো বেটা তোমারি ॥
রসুলের ও কথা শুনে তবে তো আকলিমের মাতা
আল্লার দরবারে বিবি করলেন জারি।

৭৮। সবল
৭৯। মৃত্যু
৮০। সময়
৮১। অসুখ
২। কবর
৮৩। কষ্ট

দেখ সে মায়ের দোয়াতে খালাস পাইল আজাবেতে
কইছে মুস্তাজ সভা হতে মার দরজা ভারি।

পতৃবন্দনা

বাপের কাছে মায়ের কথা হয় না তুলনা।
বাপজি হ'চ্ছে জন্মদাতা—জেনেও জানো না॥
পিতা হ'ল গাছের গুঁড়া, ফল ধরে কি শিকড় ছাড়া।
ডালে পাতে আছে জড়া—দেখ দু'জনা॥
বাপের চারি মায়ের চারি অজু দেতে আছে তৈরী।
আরো দশ সারি সারি ছিলেন রব্বানা[৮৪]॥
দেখ বাপের শিরোমণি অজুদে হোল নিশানি।
কে হবে পিতার সানি[৮৫] মাতা দেখ না॥
বাপ যদি মোর না থাকিত মা আমারে কোথায় পেত
জারজপুত্র বলে মোরে দিত গঞ্জনা।
মুস্তাজ আলি কইছে যারা বাপের গুণ গাহিত সারা
জারজপুত্র হোল তারা বাপকে চিনে না॥

বেদের গান

১। সাপা বলে সাপীনিকে—শোন গো কুলের কথা,
কৃষ্ণ অবতারে সাপার জন্ম হল কোথা।
জনম হল যেথা সেথা দেবকির উদরে,
দেবকিকে নিয়ে গেল গোকুলনগরে.
গোকুলনগরে ছিল লোহার বাসরঘর,
তাতে শুয়ে নিদ্রা যেছে বালা লখিন্দর।
হাতে কৃষ্ণের মোহন বাঁশি, মাথায় চাঁচর চুড়।
হাসিতে খেলিতে যেছে কালিদহের কূল

৮৪। খোদা
৮৫। তুলা

কালিদহের কূলে রে ভাই যত নাগনারী
কৃষ্ণকে দেখিয়া সব করে সরাসরি।

২। চাঁদসদাগর রাখবো না তোর বংশে দিতে বাতি গো।
বাদরেরি বাদ বালার নয়কো কভু ভাল গো।
কি হল কি হল বলে দেখিতে লাগিল,
সুতার সঞ্চার হয়ে কালনাগ বাসরে সিঁধিল গো।
বাসর সময়ে কালিনাগ ভাবে মনে মনে গো
এমন সোনার লখিন্দর দংশিব কেমনে গো
উপর খাটে শুয়ে বেহুলা, নামু তক্তে পা গো
কড়ি আঙ্গুল চেপে বালার হানিল কামড় গো
কোন সাপে কামড় দিলে দেখিতে লাগিল গো
বিষে অঙ্গে জর জর কালিয়া করিলে গো
কি হল কি হল বলে বেহুলা কাঁদিতে লাগিল।

বৈষ্ণব সঙ্গীত : নিমাই সন্ন্যাস

আজি জয় নিত্যানন্দ প্রভু জয় নিত্যানন্দ
আজি অদ্বৈত চাঁদভক্ত গৌরভক্তবৃন্দ
নবদ্বীপে বন্দী ছিলেন শচীমাতা ঠাকুরাণী
তার গর্ভে শ্বেতমাছিরূপ ধারণ করে
গর্ভে জন্মিল সাধের গোঁসাই গুণমণি
একমাস হল দুই মাস হল
পঞ্চম মাসের বেলায় মায়ের জানাজানি হল
দশ মাস দশদিন পরিপূর্ণ হল
ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমার দিনে মায়ের প্রসব গত হল।
হাঁটুর উপর ভর দিয়ে প্রসব করতে যায়
তাঁহার কাঁদনে কত নদী বহে যায়
কত শত গাছের কচি কচি পাতা খসে পড়ে।
ফলে ফুলে গুণের নিমাই ভূমিতে পড়িল
বসুমতী রূপ ধারণ করে সন্তান ধরিল
হৃদয় কোমলপদ্ম যেমন সুবর্ণর চাকু দিয়ে নাভি ছেদন করিল।

পূর্ণিমার চাঁদ যেমন গৃহেতে লুকাইল।
তিনদিনের হল নিমাই দুগ্ধ নাহি খায়
শচীমাতা নগরের লোককে শুধায়
আজ সাধের গোঁসাই গুণমণি বটে
তোমাদের বাড়ীতে সাতদিন সাত রাত হরিনাম করাইতে হবে।
সেই কথা শুনে শচী মোদের
বাড়ীতে সাতদিন সাতরাত হরিনাম করাইল
সেইদিন হইতে গুণের নিমাই দুগ্ধপান করিল।
পঞ্চম মাসের যখন হল নিমাই
পঞ্চম পণ্ডিত লয়ে নিমাই-এর নামের ভোজন
আর মুখে লবান একসাথেই দিল।
পঞ্চম বছরের যখন হল নিমাই-এর হাতে খড়ি যে দিল।
নয় বছরের যখন নিমাই হল
নিমাই-এর তবে পৈতা যে দিল।
দশবছরের যখন হল
কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে বিবাহ দিল।
পড় পড় রে প্রসাদের পুত্র নিমাই দিবানিশি পড়
শ্রীভাগবতপাঠ বল শুনি।
পড়া বলিতে না পারে নিমাই লিখিতে না পারে
অতি ক্রোধ হয়ে পণ্ডিত মারে ছড়ির বাড়ি
কাঁদতে কাঁদতে যায় নিমাই চন্দন গাছের গুঁড়ি
চন্দনগাছের গোঁড়ায় নিমাই অবতার পাতিল
ষড়ভুজা মূর্তির রূপ নিমাই পণ্ডিতকে দেখাইল।
গলায় কাপড় দিয়া পণ্ডিত নমস্কার করিল
না বুঝে মেরেছি বাবা—ক্ষম অপরাধ
অন্তিমকালে দিও তোমার রাঙা চরণ দুখানি।
রামরূপে ধনুক ধরে, কৃষ্ণরূপে বাঁশি
চৈতন্যরূপে হলেন নিমাই গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী।
চব্বিশ বছরের নিমাই যখন হল
সন্ন্যাসধর্ম মনে পড়ে গেল

ডোর নিল, কৌপীন নিল, কমণ্ডুল নিল হাতে
পাপীকে তরাতে যায় শচীর দুলাল
কিবা ক্ষণে এসে কেশবভারতী কিবা মন্তর দিল
সেইদিন হইতে গুণের নিমাই আমার উদাসীন হইল।
খাট পরে শচীমাতা সুখে নিদ্রা যায়
যমের ভগ্নী এসে মাকে কালনিদ্রা আসায়
ধর্মে যাওয়ার বেলা নিমাই 'মা মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল
অভাগিনী শচীমাতার চেতন নাহি পেল।
ব্রজের কোকিল বলে নিমাইকে বিদায় দিল
যারে তুই ব্রজের কোকিল যারে ব্রজে ফিরে।
কাঁদিতে কাঁদিতে নদের নিমাই কাটোয়াতে গেল চলে।
রাত প্রভাত হইল কোকিল কাড়ে রা
অভাগিনী শচীমাতা শয়নমন্দিরে ছিল ঝেড়ে তুলে গা
'নিমাই নিমাই' বলে শব্দ করিতে লাগিল গ্যাখো—নদের লোক
আমার নিমাই যাচ্ছে সন্ন্যাসধর্মে কেউ রাখো বলে কয়ে।
কেউ বলে—তোর নিমাই যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়ে মন
কেউ বলে—তোর নিমাই নদে ছেড়ে কাটোয়ায় গেল।
হয়ে কেন মরিস নি নিমাই না করিতাম কোলে
কাল তোরে বিয়ে দিলাম কুলীন ব্রাহ্মনের ঝি
ভরা আজ বিষ্ণুবধূ জলন্ত অগ্নি কেমনে রাখিল মুখবাণী দিয়ে
সেই কথা শুনে নিমাই অধিষ্ঠান হইল
খোল বাজে, মৃদঙ্গ বাজে—বীণায় করতাল
সবার মাঝে নৃত্য করেন ঠাকুর শচীর দুলাল।
জয় জয় জয় জগন্নাথ মহাপ্রভু যার শুনিবার কাহিনী
ডানধারে বলরাম—মধ্যে সুভদ্রা ভগিনী
জগন্নাথপুরী যেতে বেউল বাঁশের কাঁটা।
জগন্নাথ পুরীতে জেতের বিচার নাই
শূদ্রতে রান্না করে—ব্রাহ্মণ মেগে খায়।